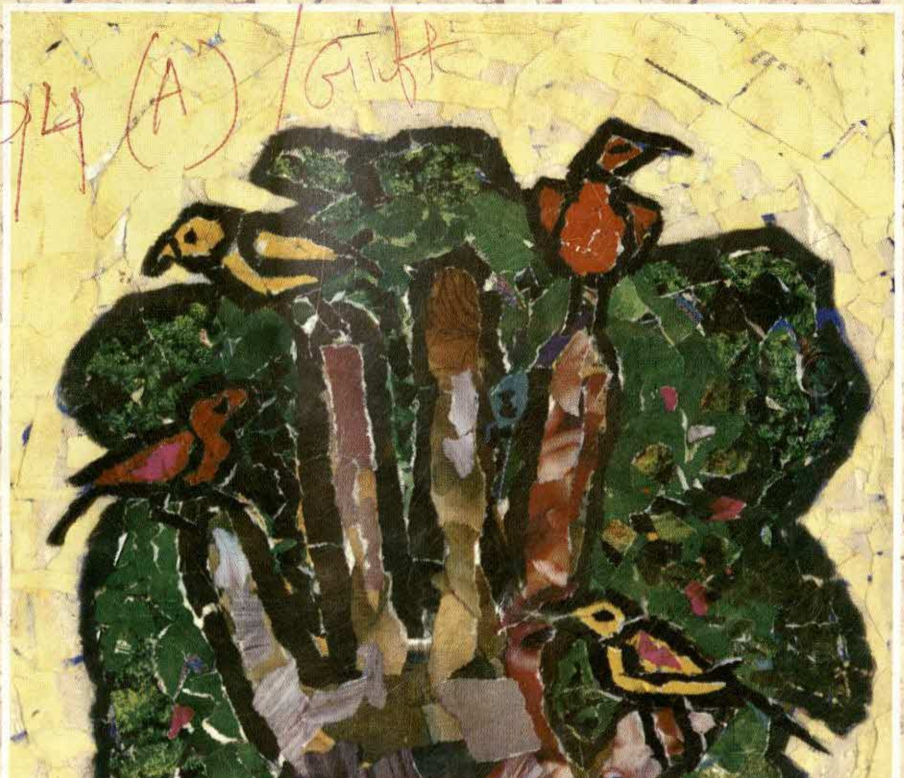
সদর্থক বিদ্যালয় পরিবেশের সন্ধানে



394(A)/Gift

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

শিখনে শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুক্ত পরিবেশ নির্মাণসহ মানসিক চাপ হ্রাসের কৃৎকৌশল-সংক্রান্ত ভিত্তিপত্র

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

প্রকাশ
মার্চ, ২০০৯

প্রকাশক
ড. পার্থ রায়
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

মুদ্রক
বঙ্গবাসী লিমিটেড
২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন - ২৩৫০-০৫৩৮ / ৯৮৩০০৫৬৩৮০

প্রাক্‌কথন

সমানাধিকার, সামাজিক ন্যায়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ সহ গড়ে ওঠা মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের আত্মমর্যাদা ও অধিকারবোধের চর্চার ক্ষেত্ররূপে আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে আমরা গড়ে তুলতে চাই। সেইজন্য শিক্ষকদের সঙ্গে বিদ্যালয় সমাজের শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক নির্ভরতার ব্যতিহারী কর্মকাণ্ডের সক্রিয় ক্ষেত্র রূপে বিদ্যালয়কে গতিশীল করে তুলতে হবে। শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্‌বেগমুক্ত প্রশ্নমনস্কতা ও অংশগ্রহণমূলক আনন্দদায়ক পরিবেশে তাদের রুচি, আগ্রহ ও চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান জটিল পরিস্থিতির দূষণযুক্ত বাতাবরণ ক্রমাগত অধঃপতনের অতলজলের হাতছানি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে - এর সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় সমাজ পরিবেশের মতো বিদ্যালয় সমাজেও ক্রমাগত মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানোর চেষ্টা করছে। কিশোর শিক্ষার্থীরা যৌবনের প্রবেশদ্বারে এর ফলে দিশাহীন হয়ে পড়ছে এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে সফল হতে পারছে না। বিশ্বব্যাপী এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত কঠোর ব্যবহার ও শারীরিক শাস্তিবিধান তাদের মানসিক পরিমণ্ডলে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণগত ক্রমোন্নয়ন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। জ্ঞানের সরণিতে বোধের উন্মেষের পথে সমস্যা সমাধান ও জীবনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সামর্থ্য অর্জনের দ্বারা জীবনাচরণে মূল্যবোধের ফলিত প্রয়োগই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের সঠিক দিশাতে অগ্রসর হবার যোগ্যতা অর্জনের সাহায্যেই আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনকার জীবনের জটিল সমস্যার মোকাবিলা করার সামর্থ্য অর্জনে সফল হতে পারবে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ "শিখনে শিক্ষার্থীদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুক্ত পরিবেশ নির্মাণসহ মানসিক চাপ হ্রাসের কৃৎকৌশল" সংক্রান্ত ভিত্তিপত্রটি শিক্ষকশিক্ষিকাদের কর্মশালার জন্য রচনা করেছে যার সাহায্যে মাননীয় শিক্ষকশিক্ষিকাবৃন্দ পরিস্থিতির উপযোগী শ্রেণিকক্ষের উপযোগী কৃৎকৌশল গ্রহণ করতে পারেন এবং নবীন শিক্ষার্থীদের সমস্যাসংকুল পরিবেশের উপযোগী মানসিকতা অর্জনে সাহায্য করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সবচেয়ে ভরসাস্থল আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাবৃন্দ। আমি আশা করি এই ভিত্তিপত্রের সাহায্যে তাঁরা তাদের বিদ্যালয় পরিবেশে পরিস্থিতি উপযোগী কৃৎকৌশল গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন ও শিখন প্রক্রিয়াকে অর্থবহ ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারবেন।

এই ভিত্তিপত্রের প্রধান রূপকার বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপিকা পুষ্পা মিশ্র, অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা সান্যাল, ডঃ পৃথা মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক ডাঃ সত্যজিৎ আশ। এই চারজনের কাছে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ একান্তভাবেই ঋণী। এই ভিত্তিপত্র সম্পূর্ণভাবে তাঁদের পরিকল্পনা ও লিখনে সমৃদ্ধ।

এই ভিত্তিপত্র প্রস্তুতিতে মন ফাউন্ডেশন প্রকাশিত "ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা ও জীবনকুশলতা শিক্ষা" নামক দুটি পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এতদব্যতীত এই ভিত্তিপত্রের প্রস্তুতি পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব অধ্যাপক স্বপন কুমার সরকার, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জয়দেব সান্যাল, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, জয়ন্তী রায়, দেবাশিস মন্ডল, পুলক গোস্বামী ও সুনীল কুমার দাসের মূল্যবান অংশগ্রহণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি।

পর্ষদের সর্বশিক্ষা মিশন বিভাগের পরামর্শদাতাগণ - প্রশান্ত ধর, অজিত কুমার সাহা ও বিনয় কুমার সরকার সহ কর্মীবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাই তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য।

এই কর্মশালা রূপায়ণে মধ্য শিক্ষা পর্ষদকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছেন মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি অত্যন্ত প্রত্যয়ী যে শিক্ষকশিক্ষিকাদের এই অভিমুখীকরণের ফলে অদূরভবিষ্যতে সকল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করবে। পরিশেষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের অর্থানুকূল্যে। সবরকম উৎসাহ প্রদানের জন্য রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তাকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ

১ ক পটভূমিকা

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল তার পরিবারের। তারপরেই বিদ্যালয়ের স্থান। শিশুর মেধা, বুদ্ধি, ধী বিকশিত করে, তার সামনে জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচিত করার অতি প্রয়োজনীয় কাজটি মূলত বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এই কাজের উপযুক্ত হওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল এটি একদিকে স্নেহ ও শাসনের মিশ্রণ, আর অন্যদিকে শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসার সমন্বয়। সার্থক শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের সুসম্পর্ক একটি আবশ্যক শর্ত।

বহুক্ষেত্রে হিংসা ও বিরোধের ঘটনা এই সম্পর্ক ব্যাহত করে ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করে। শিখন শেখানো এর ফলে ব্যাহত হয়।

শিক্ষক ও ছাত্র দু-পক্ষেরই বিরোধাত্মক আচরণ ও মনোভাবের কারণ এবং কীভাবে সেগুলি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়—সেটাই এই ভিত্তিপত্রের বিষয়বস্তু।

শিক্ষকরা যেহেতু দলনেতা বা leader-এর ভূমিকায় রয়েছেন, সুতরাং এই ভিত্তিপত্রটি তাঁদের উদ্দেশ্যেই রচিত।

১ খ ভিত্তিপত্রের লক্ষ্য

- বিদ্যালয়ে হিংসা ও বিরোধের বিভিন্ন ধরন বা প্রকার এবং তার নঞর্থক ফলাফল বুঝতে পারা।
- শিশুর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।
- নিজেদের বিরোধ ও হিংসামূলক আচরণের কারণ বুঝে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারা।
- ছাত্রের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে তার সঙ্গে সহমর্মিতার মাধ্যমে, তার অসুবিধে, সমস্যা ইত্যাদি অনুধাবন করা।

১ গ ভিত্তিপত্রের কর্মসূচি

১. ক পটভূমিকা
১. খ ভিত্তিপত্রের লক্ষ্য
১. গ ভিত্তিপত্রের কর্মসূচি
১. ঘ মন্তব্য
১.১ ভিত্তিপত্রের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি
১.২ পারস্পরিক পরিচিতি
১.৩ প্রাথমিক নিয়মাবলি
১.৪ মূল বিষয়ের উপস্থাপনা
১.৫ কর্মশালার প্রয়োজন নির্ধারণ
১.৬ আত্মসচেতনতা
১.৭ আবেগ/অনুভূতির সঙ্গে পরিচয়
১.৮ অনুশীলনী - ১ আবেগ/অনুভূতি সংক্রান্ত পল একম্যানের ছবি
১.৯ অনুশীলনী - ২ পল একম্যানের ছবি
১.১০ আলোচনা
১.১১ অনুশীলনী - ৩ আমার জীবনের পাঁচটি আঙুল
১.১২ আলোচনা
১.১৩ অনুশীলনী - ৪ রোয়েসলারের প্রশ্নাবলি
১.১৪ আলোচনা
১.১৫ আবেগগত শিক্ষা
১.১৬ অনুশীলনী - ৫ নিজের অনুভূতিকে চেনা
১.১৭ আলোচনা
১.১৮ সহমর্মিতা
১.১৯ অনুশীলনী - ৬ সহমর্মিতার প্রতিক্রিয়া
১.২০ অনুশীলনী - ৭ সহমর্মিতার প্রশ্নাবলি
১.২১ আলোচনা
১.২২ সংযোগস্থাপন
১.২৩ অনুশীলনী - ৮ অ - ভাষাগত সংযোগস্থাপন

১.২৪ আলোচনা
১.২৫ অনুশীলনী - ৯ সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা
১.২৬ আলোচনা
১.২৭ ক্রোধ প্রশমন বা সংবরণ
১.২৮ অনুশীলনী - ১০ রাগের অভিব্যক্তি চিহ্নিতকরণ
১.২৯ অনুশীলনী - ১১ রাগের অভিব্যক্তি চেনা ও নিয়ন্ত্রণ
১.৩০ আলোচনা
১.৩১ মানসিক চাপ নির্ণয় ও প্রতিকার
১.৩২ অনুশীলনী - ১২ মানসিক চাপ ও ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন
১.৩৩ আলোচনা
১.৩৪ অনুশীলনী - ১৩ ব্যক্তিগত, কর্মক্ষেত্রে ও সার্বিক পেশাগত জীবনের চাপ নির্ধারণ
১.৩৫ আলোচনা
১.৩৬ মানসিক স্বাস্থ্য
১.৩৭ শারীরিক শাস্তি : বিকল্প পথ
১.৩৮ নাটিকা : উত্তরণ
১.৩৯ অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য

১ ঘ মন্তব্য

এই ভিত্তিপত্র তিনদিনের কিন্তু প্রয়োজনে কর্মশালার সময় এবং দিন বাড়ানো যেতে পারে। প্রতিটি অনুশীলনী এবং তার পরের আলোচনায় আরও একটু সময় বাড়ানো যেতে পারে।

পারস্পরিক পরিচিতির ক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডার না থাকলে অন্যভাবেও করা যেতে পারে। যেমন সকলে এক জায়গায় মিলিত হয়ে এলোমেলো ভাবে ঘুরতে লাগলেন। তিন মিনিট পরে দলনেতা থামতে বললেন। তখন যে যার সামনে বা কাছে আছেন তাঁর সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিচয় করলেন।

শিক্ষণের উপকরণ :

- ফ্লিপ চার্ট বা মার্কার
- কম্পিউটার বা এল সি ডি প্রোজেক্টর অথবা ও এইচ পি এবং পারদর্শক পৃষ্ঠায় তৈরি বিষয়বস্তু
- লিখবার জন্য কাগজ
- হ্যান্ড আউট
- টেপ রেকর্ডার বা বাজনার ব্যবস্থা।

১.১ ভিত্তিপত্রের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

ভিত্তিপত্রের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

১.২ পারস্পরিক পরিচিতি

উপকরণ :

টেপ রেকর্ডারে কোনো বাজনা বা যন্ত্রসংগীত।

পদ্ধতি :

টেপ রেকর্ডারে বাজনা বাজানো শুরু হবে। অংশগ্রহণকারীরা এলোমেলো ভাবে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা শুরু করবেন। মিনিট ৫/৭ বাজনাটি বাজার পর সেটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সুর থামিয়ে দেওয়ার সাথে-সাথে যে-যেখানে ছিলেন, সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁর সামনে অথবা কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গী বলে বিবেচিত হবেন। সঙ্গীদ্বয় দল থেকে সরে এসে হলে চেয়ারে বসতে পারেন অথবা একটু দূরে সরে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করবেন। যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে জানার চেষ্টা করবেন, সেগুলি হল —

- নাম
- পেশা
- বিবাহিত / অবিবাহিত অথবা ডিভোর্সি
- বিশেষ গুণ / আগ্রহ

এই কাজগুলির সময়সীমা ৩ মিনিট। ৩ মিনিট শেষ হলে হাততালি দিয়ে সময় শেষ হবার ইঙ্গিত দেওয়া হবে। এরপর তিন মিনিটে অপর সঙ্গীটিও তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে একই বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ করবেন বা পরিচিত হবেন। আবার তিন মিনিট পরে হাততালি দিয়ে সময় শেষের ইঙ্গিত করা হবে। সকলে বড়ো দলে ফিরে এসে নিজের - নিজের আসন গ্রহণ করবেন যার যার সঙ্গীকে পাশে রেখে। এবারে এক-এক করে সকলে বড়ো দলের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীর পরিচয় করিয়ে দেবেন।

১.৩ প্রাথমিক নিয়মাবলি

দলের প্রত্যেকে তিনদিন কর্মশালা চলাকালীন কী কী নিয়ম মেনে চলবেন তা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করবেন। নিয়মগুলি ফ্লিপ চার্টে লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হবে অথবা সেলোটেপ দিয়ে সেঁটে দেওয়া হবে।

১.৪ মূল বিষয়ের উপস্থাপনা

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মুখ্য কেন্দ্র হল তার পরিবার। পরিবার শুধু যে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের দিকে লক্ষ রাখে তাই নয়, বরং শিশুর সামাজিকীকরণ (Socialization)-এর প্রক্রিয়াও পরিবারেই শুরু হয়। সম্ভবত পরিবারই এই প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারের পরেই আসে বিদ্যালয়ের স্থান। শিশুর বুদ্ধি ও মেধার যথাযথ বিকাশে সহায়তা দান করে, তার মধ্যে যথাযথ মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার তার সম্মুখে উন্মোচিত করে। বিদ্যালয় শিশুর জীবনে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পরিবার অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশুর কাছে আদর্শ (role-model) হয়ে দাঁড়ান, তাঁদের মূল্যবোধ শিশু নিজের ব্যক্তিত্বে অঙ্গীভূত করে নেয়। এ সম্পর্ক একদিকে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত সম্মানের আর অন্যদিকে স্নেহমিশ্রিত শাসনের। শিক্ষক ও ছাত্র, গুরু আর শিষ্যের মধ্যে এই সম্পর্কই শিখন শেখানোর পক্ষে আদর্শ।

এই আদর্শ প্রায়ই খণ্ডিত হয় যখন বিদ্যালয়ের পরিবেশে আমরা হিংসার প্রকাশ দেখি। এই হিংসা ও তজ্জনিত বিরোধী মনোভাব শিখন প্রক্রিয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তবু এধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে এবং শিক্ষাবিদরা এ সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করছেন যাতে বিদ্যালয়ের পরিবেশে হিংসা ও বিরোধের মনোভাব যথাসম্ভব কমানো যায়। সমস্যাটির একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রথমে দেখা যাক, হিংসা বলতে আমরা কী বুঝি?

হিংসার অভিধানগত অর্থ হল : আঘাত দেবার জন্য দৈহিক বলের প্রয়োগ (Webster's 9th Collegiate Dictionary)। সংসদ অভিধান 'violence' শব্দের অর্থ দিয়েছেন : "যৎপরোনাস্তি, প্রবলতা, তীব্রতা বা উগ্রতা, প্রচণ্ডতা, হিংস্রতা।" (P 72) এই অর্থ অনুসারে দৈহিক আঘাত দেওয়া যেমন হিংসার পর্যায়ে পড়ে, তেমনি উগ্র ব্যবহার, কঠোর বাক্য প্রয়োগ, অপমানজনক ভাষার ব্যবহার ও হিংসার প্রকাশ। এই ধরনের আচরণ আমরা কিছু - কিছু পরিবারে দেখতে পাই এবং সমাজের অন্য অনেক স্থানে তা দেখা যায়। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হল বিদ্যালয়ের পরিবেশে সচরাচর আমরা কী ধরনের হিংসার প্রকাশ দেখি এবং তা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশে হিংসা ও বিরোধ প্রকাশের দুটি দিক আছে :

১. শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের মধ্যে হিংসা ও বিরোধের ঘটনা

২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বাদ-বিসংবাদ

প্রথমক্ষেত্রে হিংসার প্রকাশ ঘটে সাধারণত শিক্ষার্থীদের দৈহিক শাস্তিদানের মাধ্যমে। এই দুটি ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়টি বহুক্ষেত্রে তুচ্ছ কথাকাটাকাটি থেকে শুরু করে নানাবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

আমরা প্রথমে দৈহিক শাস্তির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।

দৈহিক শাস্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে :

> ***"ছাত্রের কোনো ব্যবহারে পরিবর্তন আনার জন্য বা ওই ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া, দৈহিক অসুবিধের সৃষ্টি করা অথবা বলপ্রয়োগ করা।"***

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তিদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এধরনের শাস্তির উদাহরণ হল :

- ✓ বেত দিয়ে মারা
- ✓ হাঁটু গেড়ে বসানো
- ✓ বেঞ্চির উপর দাঁড় করানো
- ✓ স্কেল বা রুলার দিয়ে আঘাত করা
- ✓ ডাস্টার ছুঁড়ে মারা ইত্যাদি।

কঠিন শাস্তির ক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষার্থীকে রোদে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, চাবুক দিয়ে মারা হয়েছে, মারতে মারতে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছে, স্কুলের মাঠে রোদে অনেকগুলো চক্কর লাগাতে বাধ্য করা হয়েছে, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি।

এছাড়াও শাস্তিদানের অন্য একটি পন্থা হল ছাত্রটিকে অনুভূতিগতভাবে নিগৃহীত করা। প্রথমটির কুফল সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে যথেষ্ট সচেতন হয়েছি কিন্তু দ্বিতীয়টির কুফল সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন নই — না পরিবারে, না বিদ্যালয়ে। ***"তুই কিছু পারবি না", "তোর দ্বারা কিছু হবে না", "মাথায় গোবর পোরা"*** ইত্যাদি নির্যাতনেরই প্রকাশ। এ ধরনের মন্তব্য যে সারা জীবনের মত একটি শিশুর আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করে দিতে পারে, তা আমরা চিন্তাও করি না। ইউনাইটেড নেশন্‌স্ এই কারণে তাঁদের 'Positive Discipline' নামক পুস্তিকায় অনুভূতিগত নিগ্রহকে দৈহিক শাস্তির পর্যায়েই ফেলেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্রকে একই ধরনের অবমাননা ভোগ করতে হয়, একইভাবে উপহাসের পাত্র হতে হয়। তাই এই দুই ধরনের নিগ্রহ বন্ধ করার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছাত্রকে শিক্ষক শাস্তি দেবেন বা দিতে পারেন — এটাই মেনে নেওয়া। অনেকে বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন যে দৈহিক শাস্তি ছাড়া বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। পশ্চিমি দেশেও Paddling (ক্রিকেটের ব্যাটের মতো চওড়া এবং হ্যান্ডেল বিশিষ্ট কাঠের রুলার যা দিয়ে ছাত্রদের প্রহার করা হত), Caning এবং হাত দিয়ে মারা বিদ্যালয় চত্বরে শৃঙ্খলা রক্ষার অন্যতম উপায় রূপে গণ্য হত। বহু বাবা-মা শিক্ষককে তাঁদের ছেলেদের মারতে বলতেন কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন, না মারলে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। ২০০৪-২০০৫ সালে কমপক্ষে ২,৭২,০০০ এবং অধিকতম ১.৫ কোটি ছাত্র-নিগ্রহের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেছে। এই নিগ্রহ সাধারণত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক অথবা অন্য

কোনো শিক্ষা-অধিকারীর দ্বারা ঘটেছে। আমাদের দেশেও শাস্তিদানের এই প্রবণতা এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট বেশি।

গত ২০ বছরে দৈহিক শাস্তির শারীরিক ও মানসিক ফলাফল সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে দুটি বিশেষ ফলাফলের উপর আলোকপাত হয়েছে :

১. শাস্তিদানের ফলে এক তাৎক্ষণিক শৃঙ্খলা আসে কিন্তু প্রকৃত অনুশাসন ছাত্রদের মধ্যে তৈরি হয় না;

২. যেসব স্কুলে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয় না, সেখানকার ছাত্রদের পরীক্ষার ফল, যেখানে শাস্তি দেওয়া হয়, তাদের তুলনায় ভালো বই খারাপ নয়।

তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বহুরাজ্যে শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে। প্রায় ১০০টি দেশ বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তিদান নিষিদ্ধ করেছে।

দৈহিক শাস্তির ফলাফল :

দৈহিক শাস্তিদানের মাধ্যমে যে ছাত্রছাত্রী বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুশাসন গড়ে তোলা যায় না — এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বরং এ কথা বলা যায় যে এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি হয়েছে। এমনকি শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও যে দৈহিক শাস্তি বিশেষ কার্যকরী — তার সপক্ষেও স্পষ্ট প্রমাণ নেই। প্রহার বা কঠিন দৈহিক শাস্তির ফলে ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি, শিক্ষক বা পিতামাতার প্রতি সম্মানবৃদ্ধি বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি হয়েছে — এমন কোনো সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত বা তথ্যভিত্তিক নয়।

বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে যে :

✓ **দৈহিক শাস্তি যে একেবারে শেষ পন্থা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, তা নয় ;**

✓ **যেসব বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয় না, সেখানে যে হিংসার মাত্রা বেশি, তাও নয়;**

বিদ্যালয়ে যেসব ছাত্ররা দুষ্টুমি বা হিংসামূলক আচরণ করছে, তাদের অনেকেই হয়তো বাড়িতে দৈহিক শাস্তি পেয়েছে। সেই শাস্তির প্রতিক্রিয়াই তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। বিদ্যালয়েও দৈহিক শাস্তি তাদের সেই আক্রমণাত্মক মনোভাব আরও বাড়িয়ে দেয়।

গবেষণায় জানা গেছে যে দৈহিক শাস্তি শিখন প্রক্রিয়ায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে কোনোক্রমেই ফলপ্রসূ বলা চলে না। বরং এটি একটি নেতিমূলক বা শিখনের বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করে। শ্রেণিকক্ষে এক ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয় যা কখনই পঠন-পাঠনের উপযোগী নয়। এই ভয়ের বাতাবরণের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ সংযোগস্থাপন যা শিখনের পক্ষে অপরিহার্য তা হয় না। সুতরাং এ ধরনের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাগ্রহণ কম হয়, বেশি নয়।

দৈহিক শাস্তি শুধু যে শিখনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে তাই নয়, এর ফলে বহু শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিও হয়েছে। হাইম্যান ও অন্যান্যরা বারে বারে সতর্ক করেছেন যে, যেসব শিক্ষার্থীরা দৈহিক শাস্তি পেয়েছে, তাদের অর্ধেকই এক বিশেষ মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছে। এই মানসিক অবস্থাকে তাঁরা EIPTSD (Educationally Induced Post-traumative Stress Disorder) আখ্যা দিয়েছেন।

এই শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত অসুবিধে ভোগ করে :

- ✓ ঘুমোতে অসুবিধে
- ✓ ক্লান্তি
- ✓ বিষাদ ও চরম মূল্যহীনতার অনুভূতি
- ✓ আত্মহত্যামূলক চিন্তা
- ✓ মাঝে-মাঝেই প্রবল উৎকণ্ঠা
- ✓ বেশি রাগ মাঝে-মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পায়
- ✓ সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়া;
- ✓ অমনোযোগ
- ✓ পরীক্ষায় ভালো-না-করা
- ✓ আসামাজিক ক্রিয়াকলাপ
- ✓ কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রবল বিরূপ মনোভাব
- ✓ নানান শারীরিক অসুবিধে
- ✓ স্কুলে যেতে না-চাওয়া
- ✓ স্কুল ছেড়ে দেওয়া

এবং আরও কিছু নেতিমূলক ব্যবহার ও মনোভাব। আগের কিছু গবেষণায় জানা গেছে যে, যে সমস্ত ছাত্ররা দৈহিক শাস্তি পেয়েছে তাদের মধ্যে **'বিদ্রোহী মনোভাব'** অনেক বেশি থাকে এবং তারা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ।

এটাও প্রমাণিত যে শাস্তিকে কার্যকরী করতে হলে ক্রমে ক্রমে শাস্তির মাত্রা বাড়াতে হয়। যে ছেলে প্রথমে এক বেত খেলেই শান্ত হয়ে বসত, ক্রমশ তাকে বেত মারার সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে, তা - না হলে উদ্দিষ্ট ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

দৈহিক শাস্তিদানের ফলে এক তাৎক্ষণিক শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এই তাৎক্ষণিক শৃঙ্খলাই শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও দৈহিক শাস্তি প্রদানকে সুদৃঢ় করছে। কিন্তু এর সুদূর প্রসারী ফলাফল যথেষ্ট চিন্তাজনক। দেখা গেছে, যে সমস্ত ছাত্ররা দৈহিক শাস্তি পেয়েছে ভবিষ্যতে নিজেদের পরিবার পরিজনের ক্ষেত্রে বেশি আক্রমণাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে অনেক বেশি। Gershoff ১৯৩৮ সাল থেকে প্রকাশিত ৮৮টি গবেষণার বিশ্লেষণ করে

শিশুদের প্রহারের short term ও long term ফলাফলগুলি চিহ্নিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে দৈহিক শাস্তি প্রদানের একমাত্র সদর্থক ফল হল — তাৎক্ষণিক অনুশাসন বা তখনকার মত শিক্ষকের কথা মেনে নেওয়া কিন্তু এই মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এছাড়া, দৈহিক শাস্তি আরও নয়টি অবাঞ্ছিত ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত। এদের কয়েকটি হল :—

- ✓ আক্রমণমূলক মনোভাব
- ✓ অসামাজিক মনোভাব
- ✓ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা
- ✓ বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্কে সমস্যা
- ✓ দৈহিকভাবে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও এদের বেশি হয়;

Gershoff বাবা-মা, বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচেতন করে বলেছেন, তাঁরা যেন দৈহিক শাস্তি দেবার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করেন। দৈহিক শাস্তি শিশুকে কোন্ কাজটি ভালো, কোন্‌টি মন্দ তা শেখায় না এবং বাবা-মা বা শিক্ষক যেখানে অনুপস্থিত সেখানে শিশুর অবাঞ্ছিত ব্যবহার বন্ধও হয় না।

শিশুর অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা :

শিশুর অধিকার সাধারণ মানবাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ২০শে নভেম্বর ১৯৮৯ সালে ইউ. এন-এর সাধারণ সভায় শিশুর অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তা এক দুর্লভ দলিল। এর আবেদন এমনই সার্বিক যে প্রায় সব রাষ্ট্রই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষও এই দলিলে স্বাক্ষর করেছে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও তার মর্যাদা বোধের কোনোটাই যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় সব দিকই এই দলিলে বিবেচনা করা হয়েছে। পুষ্টি, শিক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তাবোধ এবং বিকাশের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ — সবগুলিই শিশুর অধিকার এবং রাষ্ট্র সে অধিকার রক্ষায় দায়বদ্ধ। ২০০১ সালে ইউনাইটেড নেশন্‌সের মানবাধিকারের হাই কমিশনার বলেন — **"কোনো ধরনের হিংসামূলক আচরণই, তা সে শারীরিক, যৌন অথবা মানসিক যাই হোক না কেন, শিশুর ভালোর জন্য করা হতে পারে না।"** এই মন্তব্যের সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈহিক শাস্তিকে শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেন্।

এন. সি. পি. সি. আর (National Commission for Protection of Child Rights) ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলির বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। শ্রীমতী শান্তা সিন্‌হা, কমিশনের চেয়ারম্যান, রাজ্যগুলির প্রধান-সচিবদের একটি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, **সব রকমের দৈহিক শাস্তি মানবাধিকারের লঙ্ঘন। সব রকমের দৈহিক শাস্তির হাত থেকে শিশুদের বাঁচাবার দায়িত্ব শিক্ষকদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের। শিশুদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার দায়িত্বও তাঁদের। শিশুরা যেন মনে না করে যে শাস্তি পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সেরূপ ঘটনা ঘটলে তারা যেন তা কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে ভয় না পায়।**

প্রতিটি স্কুল, এমনকি ছাত্রাবাসেও এমন একটি সংস্থা থাকতে হবে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রতিটি স্কুলে একটি বাক্স রাখতে হবে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের নাম-ঠিকানা গোপন রেখে তাদের অভিযোগ জমা করতে পারবে। ঐ অভিযোগগুলি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতি মাসে স্কুলের গভর্নিং বডি অথবা প্রশাসনিক সংস্থার একটি মিটিং ডাকতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা বিভাগ নজর রাখবেন যে ছাত্রছাত্রীর দৈহিক শাস্তি সম্পর্কে অভিযোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন কি-না।

সুতরাং আইনগতভাবে যা করণীয় ছিল তা করা হয়েছে। কিন্তু শুধু আইনের মাধ্যমে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। ওই বিশেষ মনোভাব কেন তৈরি হয়েছে, তার পেছনে কী কী উপাদান কাজ করছে — সেগুলো বিচার করে দূরীভূত করলে তবেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। দেখা যাক্, শাস্তিদানের মনোভাব কী কী উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং সেগুলি কীভাবে দূর করা যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটি জাগে তা হল, শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে শাস্তি দেন কেন? উত্তরটি সহজ— শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে ;

১. শিক্ষক একজন কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি (authority)

২. শিক্ষক ছাত্রের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী।

৩. ছাত্ররা শিক্ষকের আদেশ পালন করবে — এটাই আশা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন করাটাও অবাধ্যতা বলে গণ্য করা হয়।

শ্রেণিকক্ষে অনুশাসন শিখন শেখানোর অপরিহার্য অঙ্গ। তাই শ্রেণিকক্ষে অনুশাসনের প্রয়োজন আছে। যখন শিক্ষক অনুশাসন (discipline) এবং শাস্তি (punishment) কে সমার্থক বলে গণ্য করেন, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। শাস্তির মাধ্যমে যে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করা হয় তা আসে বাইরে থেকে, সেটা ছাত্রের উপর জোর করে চাপানো হয় এবং শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্র তার পূর্বের বিশৃঙ্খল আচরণেই ফিরে যায়। অনুশাসনের শৃঙ্খলা আন্তরিক। ছাত্র যখন অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সে নিয়ম - মানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নিয়ম মাফিক কাজ করে। বলাই বাহুল্য, শ্রেণিকক্ষেও এই অনুশাসনজনিত শৃঙ্খলা আনাই শিক্ষকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা যদি ছাত্রদের এই অনুভূতির জগতে আনতে চাই তাহলে শিক্ষকের ভূমিকা শুধু পাঠ্য-পুস্তক আর লিখিত বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না। ছাত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, রোল-মডেল রূপে তাঁর ভূমিকা, তাঁর নিজের অনুভূতির জগৎ এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রের আচরণ যেমনই হোক না কেন তাকে এক সুস্থ,

বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রদান করে তার সম্ভাবনা বিকশিত করার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে শিক্ষককে তিনটি স্তরে কাজ করতে হবে :

১. নিজের অনুভূতির জগৎ
২. ছাত্রের সঙ্গো সংযোগস্থাপন
৩. ছাত্রের পরিবারের সঙ্গো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

১। নিজের অনুভূতির জগৎ :

প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গো শিক্ষকের অনুভূতির কী সম্পর্ক আছে? মনে রাখতে হবে, বেশিরভাগ শাস্তি হঠাৎ রাগের মাথায় দেওয়া হয়। কোনো শিক্ষকই ভেবে আসেন না যে তিনি কোনো বিশেষ ছাত্রকে বিশেষ কোনো দিনে শাস্তি দেবেন। ছাত্রদের তথাকথিত বিশৃঙ্খল আচরণে যখন তিনি নিজের রাগ সংযত করতে পারেন না, তখনই প্রহার বা অন্যান্য দৈহিক শাস্তির আশ্রয় নেন এবং একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে রাগ একটি অনুভূতি। সেইজন্য নিজের অনুভূতির জগতের সঙ্গো পরিচয় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও ১৯৮০ সাল থেকে অনুভূতির সঙ্গো কর্মজগতের সাফল্যের যোগ নিয়ে অনেক স্তরে গবেষণা শুরু হয়েছে কিন্তু ১৯৪০ সালেই হেম্‌ফিল (Hemphill)-এর নির্দেশনায় ওহামো স্টেট ইউনিভার্সিটির দলনেতার সম্পর্কিত গবেষণায় জানা গেছে যে

— বিবেচনা বোধ দলনেতার ভূমিকার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ;

— যে সমস্ত নেতারা নিজেদের অনুগামীদের সঙ্গো এক পারস্পরিক বিশ্বস্ততা, সম্মান ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন, তাঁরা দলনেতা রূপে অনেক বেশি সফল।

পরবর্তীকালের প্রচুর গবেষণায় পারস্পরিক সম্পর্ক (Interpersonal relationship), কর্মজগতে সাফল্য এমনকি বিদ্যার্জনে সাফল্যও আমাদের অনুভূতি আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। শুধু বুদ্ধি বা মননের ঔৎকর্ষ আমাদের কর্মজগতে সাফল্যের চাবিকাঠি নয়। তাই, সর্বপ্রথমে শিক্ষককে তাঁর নিজের অনুভূতির জগতের সঙ্গো পরিচিত হতে হবে। বিশেষ করে তাঁকে পরিচিত হতে হবে :

i) **নিজের রাগ ও ক্রোধ সম্পর্কে :** কীসে তাঁর রাগ হয়? রাগ হবার সময় তিনি ***'রাগ হচ্ছে'*** এ ব্যাপারে সচেতন থাকেন কি না, অথবা রাগ তাঁকে হঠাৎই পুরোপুরি ছেয়ে ফেলে? তিনি রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টা করার অবকাশই পান না।

ii) **নিজের অহঙ্কার সম্বন্ধে :** শিক্ষক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি। ছাত্রের ছেলেমানুষি বা দুষ্টুমিকে তিনি তাঁর পদাধিকারের অমর্যাদা বলে গণ্য করেন, নাকি তাকে অল্প বয়সের দুষ্টুমিরূপে হেসে উড়িয়ে দিতে

পারেন? এই অহংবোধ অনেক সময় ছাত্রের সঙ্গে এক সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

iii) **নিজের পারিবারিক চাপ সম্বন্ধে :** শিক্ষকও মানুষ, তাঁরও স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, সন্তানাদি রয়েছে তাঁদের সঙ্গে তাঁর আবেগের বন্ধনও আছে। নানান পারিবারিক চাপ অনেক সময় প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। এই মানসিক চাপের ফলে অনেক সময় তিনি নিজের অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারেন।

iv) **নিজের উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে :** শিক্ষক যদি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, তাহলে তিনি সেগুলো শ্রেণিকক্ষের ঘটনা থেকে পৃথক করতে পারবেন। তিনি বুঝতে পারবেন চাপের উৎস কোথায়? এটা করতে পারলে শ্রেণিকক্ষের ঘটনা তিনি অনেকটা নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারবেন।

v) **নিজের ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা বা সমস্যা সম্বন্ধে :** এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। তবে একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নানান সমস্যার সৃষ্টি করে। ধরুন, কেউ যদি খুব অল্পে অপমানিত বোধ করেন, কথায়-কথায় তাঁর যদি মনে হয় ছাত্র আর শিক্ষকরা তাঁর বিরোধিতা করছে, তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করছে ইত্যাদি, তাহলে তাঁর পক্ষে ছাত্র বা সহকর্মী কারও সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে না। কাল্পনিক বিরোধিতা আর অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি হয়তো আক্রমণমূলক মনোভাব নিয়েই কাজ করবেন। এ ধরনের ব্যক্তিত্বে কিছু সমস্যা থাকে। এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হলে তিনি কর্মক্ষেত্রে অনেক সমস্যা এড়িয়ে চলতে পারবেন।

২। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক :

শিক্ষক একজন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি ঠিকই কিন্তু তিনি কী ধরনের কর্তৃত্বমূলক আচরণ করবেন, তার দ্বারা ছাত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ধারিত হবে।

i) **ভয়, না ভালোবাসা / শ্রদ্ধা :** শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ভিত্তি যদি ভয় হয় তাহলে অনুশাসন আসবে না। আমি যাকে ভালোবাসি, তারই মূল্যবোধ আমি অন্তঃস্থ বা আত্মীকরণ করি। শিশু বাবা-মাকে ভালোবাসে বলেই তাঁদের মূল্যবোধের সঙ্গে তার একাত্মতা ঘটে। ছাত্রও শিক্ষককে ভালোবাসলে, শ্রদ্ধা করলে তাঁর মূল্যবোধ আত্মস্থ করবে। এই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আসবে, যদি ছাত্র বোঝে শিক্ষক তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ব্যক্তি হিসেবে তাকে সম্মান করেন। অর্থাৎ শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক হবে। ছাত্র বয়সে ছোটো বলে সে সম্মানের পাত্র নয়, এ ধারণা ভুল। শিশুর বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তার আত্মসম্মানের বিকাশ। আমরা যদি পাঁচ বছরের এক শিশুকেও অন্যের সামনে ভৎর্সনা করি, তার আত্মসম্মান ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষক এমন কিছু করবেন

না যাতে ছাত্রের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ছাত্রের কৃতকার্যতা, সে যা-কিছু করতে পেরেছে তার প্রশংসা, যা পারেনি তা ভৎর্সনা না করে তাকে দেখিয়ে দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি সম্মান বোধ গড়ে ওঠে। ছাত্র বুঝতে পারে শিক্ষক তার কথা ভাবেন, তার সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং তাকে ব্যক্তি হিসেবে মূল্য দেন। সুতরাং শিক্ষকের মূল্যবোধ ও আদর্শ সে আত্মীকরণের মাধ্যমে নিজের করে নেয়।

ii) **আরোপিত নিয়ম, না স্ব-শাসনের নিয়ম? :** যেখানে শিক্ষক ছাত্রকে সম্মান দেন, সেখানে শ্রেণিকক্ষের নিয়ম ছাত্র ও শিক্ষক দুজনে মিলে নির্ধারিত করতে পারেন। এই নিয়মগুলি খুবই প্রাথমিক। শিক্ষক ও ছাত্র মিলে এই নিয়মগুলি তৈরি করে, একটি ফ্লিপ চার্টে লিখে দেওয়ালে সেঁটে দিতে পারেন। অন্যের আরোপিত নিয়মের তুলনায় ছাত্ররা নিজেদের তৈরি নিয়ম বেশি মানবে, আশা করা যায়। এর ফলে তাদের দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

iii) **নিষ্ক্রিয় শিখন, না পারস্পরিক আলোচনার (Participatory learning) মাধ্যমে শিখন? :** শিক্ষক পদ্ধতি যদি একতরফা না হয়ে আলোচনা ভিত্তিক হয়, তাহলে শিখনও যেমন দ্রুত হয়, ছাত্রের আত্মবিশ্বাসও তত বর্ধিত হয়। সে প্রশ্ন করতে পারে, শিক্ষক তাকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করছেন, তার কথার মূল্য আছে এই বোধ একজন ছাত্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের উৎসাহদান ও প্রশংসা তাকে আরও পড়তে, জানতে, বুঝতে উৎসাহিত করে।

এই ধরনের পড়াশোনার মাধ্যমে ছাত্র এও বুঝতে পারে যে শিক্ষক মহাশয় approachable, তাঁর সঙ্গো কথা বলা যায়, নিজের সমস্যাও বলা যায়। তিনি বুঝবেন এবং পরামর্শ দেবেন। এই মনোভাবের সৃষ্টি হলে শ্রেণিকক্ষে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আপনিই কমে যাবে।

iv) **সংযোগস্থাপন (Communication) :** এটি ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা যদি ঠিক-ঠিকভাবে শুনতে না জানি তাহলে অন্যের সঙ্গো সংযোগস্থাপনে আমাদের অসুবিধে হবে। ছাত্র মুখে যা বলছে, শিক্ষক যে শুধু সেটুকু শুনবেন, তা নয়, সে তার ব্যবহারের মাধ্যমে কী বলতে চাইছে — তাও বোঝার চেষ্টা করবেন। শিক্ষক ছাত্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া একটু মনোযোগ, একটু প্রশংসা একজন ছাত্রের জীবনধারা পরিবর্তিত করে দিতে পারে। ছাত্রদের বহু বিশৃঙ্খল আচরণ, শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষিত করার জন্য করা হয়। তাই ছাত্রদের না-বলা কথাও শিক্ষকদের বুঝে নিতে হবে, তবেই যথাযথ সংযোগস্থাপন করা হবে।

৩। ছাত্রের পরিবারের সঙ্গো ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থাপন :

ছাত্রকে বুঝতে হলে বা তার ব্যবহারে অসঙ্গাতি বুঝতে হলে শিক্ষককে তার পরিবারের সঙ্গো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে। ছাত্রদের বহু সমস্যার কারণ তার পরিবারেই নিহিত থাকে, যেমন, দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি, ছাত্রের নিজের মানসিক অবস্থা ইত্যাদি। যে ছেলে দিনের পর দিন হোমওয়ার্ক করে নিয়ে আসছে না, খবর নিলে হয়তো দেখা যাবে সে সকালে বাজারে আলুর দোকানে বসছে অথবা মদিরাসক্ত পিতা বাড়িতে প্রবল

মার-ধোর করেন। বাড়িতে পড়াশোনার কোনো পরিবেশই থাকে না। ছাত্রটি নিজে বিষাদ বা মানসিক অবসাদের শিকার কি না সেটাও জানার প্রয়োজন হতে পারে। যে ছেলে বা মেয়ে সর্বক্ষণ ছট্‌ফট্ করছে তার হয়ত ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) আছে।

এইসব ব্যাপারে ছাত্রকে সাহায্য করতে হলে আমাদের ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্যে :

১. অভিভাবকদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত অল্প আলোচনা করা দরকার;
২. ছাত্রটির বাড়ির ব্যবহার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হবে;
৩. তার কোনোরকম মানসিক অসুবিধে আছে কি-না বোঝার চেষ্টা করতে হবে;
৪. তার কোনোরকম মানসিক অসুবিধে থাকলে সে বিষয়ে অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে;
৫. তার আর্থিক অসুবিধে আছে কি-না, জানার চেষ্টা করতে হবে;
৬. তার আর্থিক অসুবিধে থাকলে সে বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগ বা স্কুল কিছু সাহায্য করতে পারে কি-না সেটাও আমরা অভিভাবকদের জানানো যেতে পারে।

আমরা যদি এইসব দিক বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের বুঝবার চেষ্টা করি, তাহলে বিদ্যালয়ে হিংসার পরিবেশ অনেকাংশে কমে যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বাদ-বিসংবাদ :

বিদ্যালয়ে হিংসার বাতাবরণের অন্য দিকটি হল ছাত্রদের দিক। বহু ক্ষেত্রে তাদের শৃঙ্খলাপরায়নহীনতা, পরস্পরের সঙ্গে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারামারি, কখনো-কখনো প্রবল হিংসাত্মক ব্যবহার (যেমনটি খেলার মাঠে প্রায়ই দেখা যায়) ইত্যাদি বিদ্যালয়ের শান্তি বিঘ্নিত করে।

ইদানিং ব্যতিক্রমী হলেও ছাত্রদের মধ্যে মারণাস্ত্র, যেমন — পিস্তল, বোমা ইত্যাদি ব্যবহারের প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের শাস্তি দেবার মূলে কিন্তু রয়েছে তাদেরই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। এই আচরণগুলির বেশিরভাগই অনুভূতিগত কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বড়ো হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন একটি অপরিণত শিশুমন পরিণত হবার দিকে এগোতে থাকে, তখন এই বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তাকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা যাতে তারা সামাজিক দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে, তার জন্য তাদের নিজেদের অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং কীভাবে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, তা শিখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিদ্যালয়ে **"Self Science"** বা **"Self Development"** নামে একটি কোর্স নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হয়। এই কোর্সের কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য-বই থাকে না, যদিও নির্দিষ্ট পাঠ্য-সূচি থাকে। বিশেষ-বিশেষ বয়সে ছেলেমেয়েরা যে ধরনের অনুভূতিগত

সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার উপর ভিত্তি করেই এই পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয় এবং সেভাবেই ছাত্রদের শেখানো হয়। Self-Science এর এই পাঠ্য-বিষয়গুলিতে ছাত্রদের শেখানো হয় :

১. নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা, অর্থাৎ

(i) নিজের অনুভূতিগুলোকে চিনতে পারা এবং সেগুলির নাম শেখা;

(ii) অনুভূতি, চিন্তা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র বুঝতে পারা;

(ii) কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে যুক্তি না অনুভূতি — কীসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, তা বুঝতে পারা;

(iv) কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে কী কী বিকল্প রয়েছে সেগুলো জানা এবং সেই অন্তর্দৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা; যেমন বন্ধুরা সিগারেট বা মদ খাবার জন্য চাপ দিচ্ছে — সেক্ষেত্রে কী সিদ্ধান্ত নেব; ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, কীভাবে মেটাব, ইত্যাদি।

(v) নিজের শক্তি আর দুর্বলতা বুঝতে পারা। এর ফলে নিজের সম্বন্ধে হীনতার ধারণা বহুক্ষেত্রে দূর করা সম্ভব;

(vi) দ্বন্দ্ব মেটানো বা conflict resolution, সহযোগিতা বা দলে একসঙ্গে কাজ করা ইত্যাদিও এই পাঠ্যসূচির অন্তর্গত।

২০০১ সালে পাইলট সার্ভেতে পাওয়া গেছে যে :

শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষক স্বীকার করেন

(i) এই পাঠ্যসূচি সহযোগিতা বাড়ায়;

(ii) ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করে;

(iii) শ্রেণিকক্ষের সম্পর্কগুলো উন্নত করে।

শতকরা ৮৮ ভাগ স্বীকার করেন যে এর ফলে

(i) ছাত্রদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে

(ii) শিখন অনেক উন্নত হয়েছে;

(iii) ছাত্রদের মধ্যে নঞর্থক মনোভাবের আদান-প্রদান হ্রাস পেয়েছে।

যেসব স্কুলে এই কোর্স পড়ানো হয়েছে, সেখানে হিংসার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

আমাদের বিদ্যালয়েও আমরা এই ধরনের পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করতে পারি। ইতিমধ্যে **Life Style** বা **জীবনশৈলীর** ক্লাসেই ছাত্রদের নিজেদের অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন করা, তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, সংযোগস্থাপন, সহযোগিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শেখানো হচ্ছে।

আমরা যদি বিদ্যালয়ে হিংসার সমস্যা এই দুই দিক দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো একসময় বিদ্যালয়ে শাস্তিদান সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।

১.৫ কর্মশালার প্রয়োজন নির্ধারণ

● **উপকরণ** — ফ্লিপ চার্ট, মার্কার

● **অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে** —

● **পদ্ধতি** — **ব্রেনস্টর্মিং :** অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের প্রয়োজন বলবেন। রিসোর্স সম্পন্ন ব্যক্তি (Resource Person) সেটি একটি ফ্লিপ চার্টে লিখবেন। যে বিষয়গুলি একাধিক ব্যক্তি বলছেন, সেটা নতুন করে লেখার প্রয়োজন নেই। বিষয়টির নামের পাশে '✓' দিয়ে দিলেই হবে।

● **উপস্থাপকদের পক্ষ থেকে :** যদি উপস্থাপকদের মতামত ভিন্ন হয় অথবা তাঁরা যদি আরও কিছু বিষয় যোগ করতে চান, তাহলে তাঁরা সেটি একে-একে ফ্লিপ চার্টে লিখবেন।

ফ্লিপ চার্টটি দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হবে অথবা সেলোটেপ দিয়ে সেঁটে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গ দৈহিক শাস্তি ও জীবনকুশলতা

এই পুস্তিকার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয়স্তরে দৈহিক শাস্তির প্রচলনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সদর্থক বিদ্যালয় পরিবেশের সন্ধান।

এই সন্ধান প্রক্রিয়া অতীতেও বিভিন্নভাবে হয়েছে। শাস্তিবিধান নিয়ন্ত্রণে জারি হয়েছে নির্দেশিকা-বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। বিপজ্জনকভাবে শাস্তি দেওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে এখনও।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের আচরণ-সংশোধনের নানা পন্থা সম্পর্কে ভাবনা যেমন জরুরি হয়ে পড়েছে, এর সঙ্গে জরুরি হয়ে পড়েছে, শিক্ষকশিক্ষিকাদের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি ও আচরণের মধ্যে সদর্থক পরিবর্তনও। বেশিরভাগ শিক্ষকশিক্ষিকার মধ্যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও শিক্ষকশিক্ষিকাদের একটি অংশ ছাত্রছাত্রীদের আচরণগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে যেসব পন্থা নিয়ে থাকেন সেগুলি তাঁদের ইতিবাচক মনের পরিচয় দেয় না।

এই শিক্ষকশিক্ষিকাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের কাছে আমরা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দৈহিক শাস্তি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পরিকল্পিত Lifeskills Education (জীবনকুশলতা শিক্ষা)-এর ওপর ভিত্তি করে এই পুস্তিকা রচনা করেছি।

Life skills Education বা জীবনকুশলতা শিক্ষা মূলত সামগ্রিক মনো-সামাজিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির উপযোগী একটি পাঠ্যক্রম। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা Life skills-এর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন—

Life skills are behaviours that enable individuals to adapt and deal effectively with demands and challenges of life.

শাস্তিবিধানের প্রেক্ষিতকে মনে রেখে এখানে আমরা প্রাসঙ্গিক কয়েকটি জীবনকুশলতা নিয়ে আলোচনা করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যদ ২০০৬ থেকে বিদ্যালয়স্তরে জীবনশৈলী শিক্ষা (Life style Education) -র মাধ্যমে নির্দিষ্ট কয়েকটি জীবনকুশলতা চর্চার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নিয়েছে।

এই জীবনকুশলতাগুলি নিজেকে সম্যকভাবে জানতে, অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে উঠতে, নিজের মনের ভাবকে অন্যকে আঘাত না দিয়ে প্রকাশ করতে, নিজের হতাশা-রাগ প্রভৃতি নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতি প্রশমন ও সমাজ-গ্রাহ্য পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে, দায়িত্ববোধহীন হঠকারী আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে যুগপৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবনে।

আইনত নিষিদ্ধ এবং শিশুর অধিকার তথা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক শাস্তিদানের প্রচলনকে বন্ধ করতে উপরোক্ত জীবনকুশলতাগুলি সহায়ক মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

১.৬ আত্মসচেতনতা

বৌদ্ধিক মননের উৎকর্ষতায় আমাদের জগতে সাফল্যের গতি অত্যন্ত দ্রুত। পাওয়ার সম্ভার আমাদের অনেক কিন্তু মননের স্থিরতায় এই 'পাওয়াতে' কতটা সুখ তা যেন বোঝার সময় বা প্রবৃত্তি আমাদের কম। অনুভূতি-আবেগের তীব্রতা বা সেগুলির অভাব আমাদের মনকে কীভাবে আঘাত করতে পারে, আমরা যেন স্বভাবতই তা খতিয়ে দেখি না। তাই আমার ব্যবহার অন্য কারও মনে কী ধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে, তার সম্বন্ধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সজাগ নই। তাই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কষ্ট, অনেক অশান্তি। বুদ্ধির সাথে সাথে নিজের অনুভূতি চেনার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি —তাতে জগৎ ও জীবনকে অনেক গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, যার ফলে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়। শিক্ষক-ছাত্রের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষক যদি নিজের অনুভূতি — রাগ, দুঃখ, অপমান বোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহলে ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্কে কোন্ অনুভূতি কোথায় অসুবিধের সৃষ্টি করছে, তা তিনি বুঝতে পারবেন এবং নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন।

১.৭ আবেগ/অনুভূতির সঙ্গে পরিচয়

আমাদের আবেগ বা অনুভূতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **মুখ্য বিভাগ হল** : প্রাথমিক বা মুখ্য এবং গৌণ। মুখ্য অনুভূতিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্য অনুভূতির দ্বারা অ-মিশ্রিত। এগুলি আমাদের প্রাথমিক প্রেষণারূপেও কাজ করে। **ডারউইন**-এর মতে, এগুলি আমাদের বেঁচে থাকা (Survival)-এর পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই অনুভূতিগুলো হল —

রাগ, দুঃখ, সুখ, ভয়, বিস্ময়, বিরাগ / বিরক্তি (disgust) বা ঘৃণা।

গৌণ অনুভূতিগুলি একাধিক অনুভূতির মিশ্রণ, যেমন — ***ঈর্ষা*** ইত্যাদি।

আমাদের অনুভূতির প্রকাশ বিভিন্ন দেহ-ভঙ্গিমার মাধ্যমে ঘটে থাকে। আমরা অন্যের চেহারা এবং ভাবভঙ্গি দেখে তার অনুভূতি ধরতে পারি। এই অনুশীলনী অনুভূতির প্রকাশ আপনি কতটা ধরতে পারেন, সেটি যাচাই করবেন।

১.৮ অনুশীলনী - ১

আবেগ/অনুভূতি সংক্রান্ত পল একম্যানের ছবি :

পল একম্যানের ছবিগুলো অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করুন। যদি দল বড়ো হয়, তাহলে কয়েকটি ছোটো-ছোটো দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে একটি অনুশীলনী দিন।

- **নির্দেশ** : ছবিগুলির বাঁদিক থেকে শুরু করে, তাদের মধ্যে কী অনুভূতি প্রকাশিত হচ্ছে ক্রম অনুসারে লিখে ফেলার নির্দেশ দিন।
- তারপরে বড়ো দলে ফিরে প্রতি দলের একজন প্রবক্তাকে বলুন, তাদের দলের উত্তর সবাইকে জানাতে।
- উপস্থাপক সঠিক উত্তরটি বলে দেবেন।

১। রাগ ২। আনন্দ ৩। বিরক্তি ৪। বিস্ময় ৫। দুঃখ ৬। ভয়

১.৯ অনুশীলনী - ২

পল একম্যানের ছবি

একই পন্থায় এই অনুশীলনীটি অংশগ্রহণকারীদের করতে দিন।

উপস্থাপক বা facilitator অনুভূতি প্রকাশের যে সর্বজনীন ভঙ্গিমা আছে অর্থাৎ কিছু অনুভূতির প্রকাশে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিশেষ ভিন্নতা থাকে না, অথবা থাকলেও আমরা সেগুলি চিনতে পারি — এই বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে অনুশীলনী সমাপ্ত করবেন।

- উপস্থাপক সঠিক উত্তরটি বলে দেবেন।

১। রাগ ২। ভয় ৩। বিতৃষ্ণা ৪। বিস্ময় ৫। আনন্দ ৬। দুঃখ

পরিশিষ্ট - ১ দেখুন।

১.১০ আলোচনা

মূল বক্তব্য

এই দুটি অনুশীলনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে একটা কথা স্পষ্ট হচ্ছে। সেটা হল — অনুভূতির বা আবেগের বিশ্বজনীনতা। আমরা যে ছবিগুলি এই দুটি অনুশীলনীতে দেখলাম সেগুলি মানুষের প্রাথমিক আবেগ বা Primary Emotions এর ছবি। এই Primary Emotion গুলি হল : ***রাগ, দুঃখ, ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা আর আনন্দ***। আপনারা সবাই বা বেশিরভাগই ছবি দেখে তার মধ্যে প্রকাশিত আবেগ চিনতে পেরেছেন। দেশগত পার্থক্যও এ ব্যাপারে বিশেষ তারতম্য ঘটাতে পারেনি। সুতরাং আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে এই প্রাথমিক আবেগ আমাদের সকলের মধ্যে শুধু যে উপস্থিত রয়েছে তা নয়, এর প্রকাশভঙ্গিও সর্বজনীন। প্রকাশভঙ্গি সর্বজনীন না হলে আমরা শুধু ছবি দেখে আবেগগুলিকে চিনতে পারতাম না।

এই অনুশীলনীর মাধ্যমে আরও একটি কথা স্পষ্ট হয় : অনুভূতির এই সর্বজনীনতা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি। আমরা মানুষের চেহারা, তার ভাব-ভঙ্গিমা দেখে বুঝতে পারব তার মনে কী ধরনের অনুভূতির খেলা চলছে। এই জ্ঞান আমরা তার সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করব, তা ঠিক করতে আমাদের সাহায্য করবে।

১.১১ অনুশীলনী - ৩

আমার জীবনের পাঁচটি আঙুল

নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হলে তবেই আমরা অন্যের অনুভূতি বুঝতে পারব। শিক্ষক যদি নিজের রাগ, দুঃখ, অপমান বোধ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হন, তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন, তাঁর শিক্ষার্থীর কীসে রাগ বা দুঃখ বা অপমানবোধ হচ্ছে এবং তখনই তিনি নিজের ব্যবহারের পরিবর্তন (প্রয়োজন হলে) করতে পারবেন।

পরবর্তী **দুটি** অনুশীলনী বিভিন্ন দিক দিয়ে নিজেকে চেনার লক্ষ্যে দেওয়া হচ্ছে। তার নিজের অনুভূতির জগৎ, নিজের জীবন এবং শিক্ষক ও দলনেতারূপে তাঁর জগৎ — এই **তিনটি** দিক এই অনুশীলনীগুলোর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উপকরণ :

সাদা কাগজ ও পেনসিল

উদ্দেশ্য :

এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুশীলনীতে অংশগ্রহণকারীকে ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করা ও আত্মসমীক্ষার দিকে প্রেরিত করা। তাঁরা যেন নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ও তাঁদের নিজেদের প্রেষণা (motivation) চিনতে

পারেন, সেগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারেন এবং অন্যের কাছে তা প্রকাশ করার মাধ্যমে সংযোগস্থাপন করতে পারেন।

১. অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ছোটো-ছোটো দলে ভাগ করে নেবেন। ছয়জনের দলই হচ্ছে আদর্শ।

২. তাঁদের বলুন তাঁরা যেন কাগজের উপরে নিজেদের হাতের ছাপ এঁকে নেন। কাগজের উপরে উলটো করে হাতের চেটো রেখে পেনসিল বুলিয়ে হাতের আকার ও পাঁচটি আঙুল কাগজে এঁকে নিতে পারেন। এই সময় তাঁরা অন্যদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারেন।
হাতের প্রতিটি আঙুল প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতীক।

৩. সবথেকে আগে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের জীবনের **পাঁচটি** গুরুত্বপূর্ণ দিক ঠিক করে নেবেন।

৪. তারপরে প্রত্যেকে দলের অন্য সদস্যদের কাছে নিজেদের জীবনের ওই **পাঁচটি** দিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।

৫. সবকটি ছোটো দল এই অনুশীলনীর কাজ শেষ করে বড়ো দলে আবার মিলিত হবেন।
প্রতিটি দলের কোনো প্রতিনিধিকে তাঁর দলের সদস্যদের **সবথেকে** গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে বলতে বলুন। সুতরাং প্রত্যেক দলের প্রতিনিধি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বলবেন :

- প্রতিটি দলে কী কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।
- নিজের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করার ফলে জীবন সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা।

১.১২ আলোচনা

মূল বক্তব্য

এই অনুশীলনীটি আত্মসচেতনতা বা নিজেকে জানার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা বহু সময়ে আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকি না। জীবনে যে-যে কাজ যেমনভাবে আসছে এক-এক করে সেগুলো সম্পাদন করতে থাকি। যখন জীবনে একাধিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব বাধে বা আঘাত আসে তখনই হঠাৎ আমাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তখন অনেক সময়ই দেরি হয়ে যায়। যেমন, আমার কোনো সহকর্মী প্রোমোশান পেলেন, তখন আমার মনে হল, আমিও প্রোমোশান চাই। কিন্তু আমি আমার চাকরিকে বাস্তবে তেমন গুরুত্বই দিইনি। এই অনুশীলনী আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে বাধ্য করছে, ভাবতে বাধ্য করছে যাতে আমি আমার জীবনের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রাথমিকতা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি। এই সচেতনতা আমাদের আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করবে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই পাঁচটি দিকের পারস্পরিক প্রাথমিকতা পরিবর্তিতও হতে পারে। তার ফলে আমি

হয়তো জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ আর অবহেলিত দিকটির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমার প্রাথমিকতা পরিবর্তিত করে জীবনকে আরও সুষ্ঠু ও পরিমিতভাবে চালাতে পারি।

নিজেকে জানার ফলে, নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে জানার ফলে, শিক্ষার্থীদের বুঝতেও আমাদের সুবিধে হবে। কোনো ছাত্র যদি বলে বাড়িতে বাবার অসুস্থতার জন্য সে হোমওয়ার্ক করে আনতে পারেনি, তাহলে আমি আমার নিজের জীবনে পরিবারের যে গুরুত্ব দেখেছি, তার ভিত্তিতে ছাত্রটির মানসিক অবস্থা বুঝতে পারব। এই বুঝতে পারা আমাদের সহমর্মিতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ছাত্রের সঙ্গে এক সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

★ "Source : ESCAP HRD COURSE ON PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL SERVICES, Module Seven"

১.১৩ অনুশীলনী - ৪

রোয়েস্‌লারের প্রশ্নাবলি

উপকরণ :

- রোয়েস্‌লারের প্রশ্নাবলি
- পেনসিল বা কলম

উদ্দেশ্য :

শিক্ষক একজন দলনেতা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের ভূমিকা নেতা বা leader-এর। ছাত্রদের তিনি কীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করবেন, দিকনির্দেশ করবেন ও অনুপ্রাণিত করবেন — নেতা হিসেবে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যদি leader হন, ছাত্ররা follower বা তাঁর অনুগামী। শিক্ষক নেতারূপে তাঁর কাজে সফল হচ্ছেন কিনা সেটা অনুগামীদের প্রতি তাঁর ব্যবহারের দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হচ্ছে। রোয়েস্‌লারের প্রশ্নাবলি এই দিকটি যাচাই করছে।

পদ্ধতি :

- বড়ো দল হলেও এই প্রশ্নাবলি ব্যক্তিভিত্তিক। তবু বড়ো দলকে ছোটো ছোটো কয়েকটি দলে ভাগ করুন।
- প্রশ্নাবলি বিতরণ করুন।
- নির্দেশ — প্রত্যেকে প্রশ্নাবলি দেখে নিজে উত্তর করুন।
- বড়ো দলে ফিরে এসে প্রতি দলের প্রবক্তা বলবেন —
    - তাঁর দলে প্রত্যেকে নিজের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার সম্বন্ধে কতটা অবহিত।
    - কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করছেন কিনা।

১.১৪ আলোচনা

মূল বক্তব্য

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা দলনেতার। তিনি নিজে একজন role modelও। দলনেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সেই দলনেতার উপর যখন জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির দায়িত্ব রয়েছে।

'রোয়েসলারের প্রশ্নাবলি' দলনেতারূপে নিজেকে চিনতে সাহায্য করছে। এই প্রশ্নাবলি উত্তর করার ক্ষেত্রে গভীর ও অত্যন্ত সৎভাবে নিজের দিকে তাকাতে হবে। নিজের ব্যবহারের ধরনকে বুঝতে হবে।

প্রথম প্রশ্নে বোঝা যাচ্ছে নেতা হিসেবে শিক্ষক গণতান্ত্রিক না কর্তৃত্বমূলক। পরবর্তী প্রশ্নগুলিতে বোঝা যাবে কী ধরনের আচরণ তিনি করেন। যথাযথভাবে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে তিনি সংযোগস্থাপন করতে পারবেন কিনা। সবক্ষেত্রে যদি তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর ব্যবহারে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন আছে। তবে এই পরিবর্তন আনার জন্য তিনি কী পন্থা অবলম্বন করবেন — সেটাও তাঁকে নির্ধারিত করতে হবে।

এই অনুশীলনীর ফলে হয়তো একজন শিক্ষক বুঝতে পারলেন তাঁর আচরণ একটু বেশি সহজ, শ্রেণিকক্ষে তিনি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অসুবিধে বোধ করেন।

এই উপলব্ধির পর তাঁকে বুঝতে হবে কী কী ব্যবহারগত পরিবর্তন তিনি নিজের ক্ষেত্রে জানতে পারেন এবং কীভাবে সেগুলি আনবেন যাতে শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলারক্ষা তাঁর পক্ষে সহজ হবে।

আত্মসচেতনতার ফলে এই অনুশীলনী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যবহারগত দিক সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করবে এবং প্রয়োজন মত সংশোধনের মাধ্যমে দলনেতারূপে তাঁর ভূমিকাকে আরও অর্থপূর্ণ করতে তুলতে পারেন।

পরিশিষ্ট - ২ দেখুন।

১.১৫ আবেগগত শিক্ষা

আবেগগত শিক্ষা বলতে বোঝায় নিজের অনুভূতিকে ঠিক-ঠিক চিনে তাকে তার বিশিষ্ট নামের মাধ্যমে তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা; যেমন — ***'আমার ভয় করছে', 'আমার দুঃখ হচ্ছে', 'আমার রাগ হচ্ছে', 'আমার হিংসে হচ্ছে'*** — ইত্যাদি।

নিজের অনুভূতি চিনতে পারা যেমন জরুরি, তা অন্যকে চেনানোও ততখানিই জরুরি। আমার অনুভূতিগত চাহিদা মেটানোর জন্য আমার অনুভূতি অন্যকে জানানোর প্রয়োজন আছে। নাহলে আমাদের অনুভূতিগত চাহিদা মিটবে না। আমরা অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের অনুভূতি ঠিক-ঠিক চিনতে পারি না। আবার চিনতে পারলেও অনেক সময় ঠিক-ঠিক ভাবে অন্যদের চেনাতে বা বোঝাতে পারি না। ফলে অন্যদের সঙ্গে আমাদের অনুভূতির

হয় সংযোগস্থাপন হয় না, অথবা হলেও ভুল একটি স্তরে হয়। আবেগকে চেনা ও প্রকাশ করা একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার। শিক্ষার মাধ্যমে, তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্যের অনুশীলনের মাধ্যমে, আমরা আমাদের আবেগগত শিক্ষা বাড়াতে পারি। যেমন —

আবেগভিত্তিক শিক্ষার উদাহরণ	আবেগহীন শিক্ষার উদাহরণ
আমার অনুভূতি বলে	আমার মনে হয়...........
● আমি সমালোচিত	আমার বোধ হয়...........
● আমি অদরকারি	আমার তোমার মতো মনে হয়................
● আমি অসম্মানিত	(এটা তোমাকে উদ্দেশ্য করে ছদ্মবেশী বার্তা)
● আমি নিস্পৃহ	

- Miscommunicating own feelings — ঠিকভাবে বোঝানোর অপারগতা
- Masking our real feelings — প্রকৃত মনোভাব গোপন করা।
- Inconsistency — পরম্পরাহীন (শরীরের ভঙ্গিমা বা গলার সুর যা বলা হচ্ছে তার সাথে ব্যবহারের সাযুজ্যতা থাকছে না। কাজ চালানোর খাতিরে কথার সুরে প্রকৃতভাব ঢেকে রাখার চেষ্টা করি)

অতিব্যবহার :

- **Overuse** — কোনো কোনো শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার। মাছ খেতে 'ভালোবাসি', ঋতুপর্ণার ছবি দেখতে 'ভালোবাসি', বেড়াতে খুব 'ভালোবাসি'।

অতিশয়োক্তি :

- **Exaggeration — অতিপ্রকাশ** - ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কথা বলার মধ্যে থাকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মিথ্যাভাষণ। অতিশয়োক্তির প্রয়োজন তাদেরই, যাদের কথা দীর্ঘদিন অবহেলিত, যারা নাটকীয়তার সাহায্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে — 'আমি চুরমার হয়ে গেছি', 'আমার বোধ হচ্ছে আমার উপর দিয়ে ভারী গাড়ি চলে গেছে'।

লঘুকরণ :

- **Minimization — অতি সংক্ষিপ্তকরণ** - 'আমি বেশ আছি', 'আমি ঠিকই থাকব' এই শ্রেণির লোক দাম্ভিক বা জেদী — নয় অতিরিক্ত ভয়ে আচ্ছন্ন বা নিজের মনোভাব অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়াতেও নিজেকে যোগ্য মনে করে না। এরা নিজেদের ভাব গোপন রেখে অন্যদের সক্রিয়ভাবে দূরে ঠেলে দেয়।

পরিশিষ্ট - ৩ দেখুন।

১.১৬ অনুশীলনী - ৫

নিজের অনুভূতিকে চেনা

উপকরণ :

প্রশ্নাবলি, পেনসিল বা কলম

পদ্ধতি :

- প্রশ্নাবলি ছোটো দলের প্রত্যেককে বিতরণ করুন।
- উত্তরের শেষে দলের সঙ্গো প্রত্যেকে আলোচনা করবেন।

১.১৭ আলোচনা

মূল বক্তব্য

এই অনুশীলনীও আত্মসচেতনতারই আর এক অধ্যবসায়। অনেক সময় আমরা সারা জীবন কাটিয়ে দেবার পরও বুঝতে পারি না, কীসে আমার ভালো লাগে, কীসে আমার রাগ বা দুঃখ হয়। এই অনুভূতিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হলে আমরা আমাদের স্ট্রেসের স্তর অনেক কমাতে পারব। যা আমার রাগ, বিরক্তি বা দুঃখের উদ্রেক করে, তা আমরা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করব, যা আমাদের সুখ দেয় আমরা সেরূপ পরিস্থিতি তৈরি করতে যত্নবান হব। তার চেয়েও বড়ো কথা, নিজেদের সম্বন্ধে যদি আমরা এগুলো বুঝে স্বীকার করে নিতে পারি, তাহলে আমাদের ছাত্রদের ব্যবহার বুঝতেও আমাদের সুবিধে হবে।

১.১৮ সহমর্মিতা

সহমর্মিতা অপর একজনকে এতটাই বুঝতে পারা যে মনে হয় তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একাত্ম। অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহমর্মিতার ক্ষমতা একটি জরুরি আচরণ ক্ষমতা। আমার নিজের জায়গাটুকু সম্পূর্ণ সরিয়ে রেখে যদি আমি অপরজনের সামাজিক মানসিক আবেগগত দিকটাকে সম্পূর্ণ তার মতো করে অনুধাবন করতে পারি ও আমার নিজস্ব ভাষায় তাকে তা বোঝাতে পারি, তাকেই বলে সহমর্মিতা।

- সহমর্মী প্রতিক্রিয়া অন্যের প্রতি যত্নকে তুলে ধরে, তাকে যে বুঝতে পারা গেছে, সে বিষয়টুকু প্রমাণ করে। মানুষ সহমর্মী মানুষের সাথে মন খুলে কথা বলতে ভরসা পায়। এ ধরনের কথোপকথনে আনন্দ অনুভব করে।

- সহমর্মী কথোপকথনে একজন ভুল বুঝলে, অন্যজন তখনই তা সংশোধন করে নিতে পারে। তাতে মানুষ সম্বন্ধে আরও বেশি জানা যায়, জ্ঞানলাভ হয়।
- এ ধরনের আলাপচারিতা প্রয়োজনীয় আবেগ নিয়ে আলোচনা করে।
- সহমর্মী মনোভাবের ছোঁয়ায় অন্যজনের মনে হয় যেন মানুষটি আমায় গ্রহণ করছেন, ফলে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা সম্ভব হয়।
- বক্তা এমন অবস্থায় 'নিজেকে খুঁজে দেখা'র (self exploration) চেষ্টায় ব্রতী হতে পারে। ফলে নিজের মধ্যে গঠনমূলক পরিবর্তন (therapeutic) সম্ভব হয়।
- সহমর্মিতার অনুশীলনে আমাদের অন্যের প্রতি বিরক্তিভাব কমে, আমরা বুঝি, সঠিক বোঝা মানে ক্ষমা করে দেওয়া।
- সহমর্মিতা আমাদের বদ্ধ ধারণা (prejudice) বা নেতিমূলক চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করতে পারে। কারণ আমরা এর সাহায্যে বুঝতে পারি সঠিক ঘটনাটি কী।
- সহমর্মী মনোভাব অনেকবেশি অর্থপূর্ণ, সাহায্যকারী, তাদের বন্ধুত্বের জন্ম নেয়।

পরিশিষ্ট - ৪ দেখুন।

কী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সহমর্মী মনোভাবের বিরোধিতা করে :

- বিষয়ের পরিবর্তন
- তোমার থেকে আমি বেশি জানি জাতীয় প্রতিক্রিয়া
- বিচারভঙ্গীয় দৃষ্টিকোণ
- উপদেশ দেওয়ার মনোভাব

- **বিষয়ের পরিবর্তন :**

  যখন কোনো একজন তাঁর নিজের কথা বলছেন, তখন কথার শেষে যদি শ্রোতা বিষয়ের পরিবর্তন করেন, তাহলে তাঁর সহমর্মিতার অভাব ঘটেছে বুঝতে হবে।

  উদাহরণ :

  অমিত : ইউনিট টেস্ট এসে গেছে। এত বেশি পড়া দিয়েছেন যে ভেবে পাচ্ছি না কীভাবে শেষ করব। কাল সন্ধ্যে থেকে পড়া নিয়ে বসেছি, এখনও অর্ধেকটাই হয়নি।

  সুমিত : কাল রাত্রে অস্কার অনুষ্ঠান দেখেছিলি? দারুণ না?

এখানে সুমিত অমিতের মানসিক অবস্থা বুঝতেই পারল না। সে নিজের চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন ছিল, অমিতের উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা তার কাছে পৌঁছোলেই না।

- **তোমার থেকে আমি বেশি জানি প্রতিক্রিয়া :**

উদাহরণ দিয়েই ভালো বোঝানো যায় :

ছেলে : বাবা, আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই না। সায়েন্স আমার ভালো লাগে না। বিশেষ করে অঙ্ক। সংখ্যাগুলো যেন আমার চোখের সামনে নাচতে থাকে, আমি ধরতেই পারি না।

বাবা : আমি জানি, তুই পারবি। মন দিয়ে পড়িস্

ছেলে : না, বাবা। আমার সাহিত্য পড়তেই ভালো লাগে। আমি সায়েন্স পারব না।

বাবা : বেশি তর্ক করিস না। আমি জানি তুই কী পারবি, কী পারবি না।

এখানে বাবা ছেলের মনোভাব বুঝতেই পারলেন না। তিনি তাঁর "আমি বেশি জানি" মনোভাবেই আট্‌কে রইলেন। বিজ্ঞান-বিষয়ে ছেলের ভয়, অনীহা আর সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা তিনি ধরতে পারলেন না। এখানে সহমর্মিতার অভাব ঘটেছে।

- **বিচারভঙ্গীয় দৃষ্টিকোণ :**

কারও মানসিক অবস্থা বা মনোভাব বুঝবার চেষ্টা না করে তার মনোভাবকে 'ভালো', 'মন্দ', 'ন্যায়', 'অন্যায়ে'র মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে একটা তক্‌মা এঁটে দেওয়া উদাহরণ :

অমিত : কাকু, জানো আমার বেড়াতে খুব ভালো লাগে। মাঝে-মাঝেই মনে হয় দু-এক দিনের জন্য হলেও, কলকাতা থেকে পালিয়ে আশে-পাশে কোথাও চলে যাই।

কাকু : আশা করি, এই দু'দিনের ছুটিতে কোথাও যাস্ নি। পরীক্ষা এসে গেল, সেটা খেয়াল আছে তো।

এটা হয়তো খুব সংগত দুশ্চিন্তা, কিন্তু উত্তরটির মধ্যে সহমর্মিতা নেই। কাকু যদি বলতেন :

কাকু : বুঝতে পারছি, কলকাতার পরিবেশ তোর খুব দম বন্ধ করা লাগে। তাই একটু পালিয়ে বাঁচিস্। তাই না?

—এই উত্তরটি অমিতের মনোভাবের সহমর্মী।

- **উপদেশ দেওয়ার মনোভাব :**

কেউ যখন তার মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করছে, তখন তাকে উপদেশ দেওয়া, তার কী করা উচিত বা অনুচিত হয়তো বক্তার প্রতি শ্রোতার সাহায্যকারী মনোভাব প্রকাশ করে, কিন্তু সহমর্মিতা প্রকাশ করে না।

উদাহরণ :

অমিত : তিন বছর চাকরি করছি। এখন চাকরি ছেড়ে আবার পড়াশোনার জগতে ফিরে এলাম। কী

জানি, পারব কি - না? বয়সও তো বেড়েছে, বয়সে ছোটোদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারব কি? তাই মাঝেমাঝে ভাবছি, ঠিক করলাম কি?

সুমিত : ভালো-ভালো কোচিং সেন্টার আছে আজকাল। আমি জানি একটা, তুই ভর্তি হয়ে যা, তারপর বলে দেব।

সুমিতের উত্তরটি সাহায্যকারী মনোভাবের পরিচায়ক, কিন্তু এটি সহমর্মিতার উদাহরণ নয়। সঠিক উত্তর হত :

সুমিত : মনে তোর এখনও দ্বন্দ্ব চলছে। যদি ঠিক মতো না পারিস্, তাহলে একূলও গেল, ওকূলও গেল। তাই না?

সহমর্মিতা, যেমন আগে বলা হয়েছে, অন্যের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া অবস্থা। নিজেকে অন্যের অবস্থায় বসিয়ে তার মত করে, তার অনুভূতিকে ভোগ করে, আবার নিজের অবস্থানে ফিরে আসতে হবে। সহমর্মিতার জন্য প্রথম আবশ্যক শর্ত হচ্ছে নিজের অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আমি নিজে যে অনুভূতি ভোগ করেছি, অন্যের মধ্যে সেই অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া আমার পক্ষে সহজ। আমার যদি কোনো দিন রাগ না হয়ে থাকে তাহলে আর একজনের প্রবল রাগের সঙ্গে আমি একাত্ম হতে পারব না। আমি বুদ্ধি দিয়ে হয়তো রাগ, দুঃখ, অনুতাপ ইত্যাদির কথা বলতে পারি, বা বইয়ে যা পড়েছি, তার ভিত্তিতে বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু নিজে অনুভব করা আর বই পড়ে বোঝার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। অনুভূতি এমনই মানসিক অবস্থা যা অনুভবের মাধ্যমেই বোধ্য। তাই, যার অনুভূতির ভান্ডার যত বিচিত্র আর যত সমৃদ্ধ, তার পক্ষে তত বিভিন্ন ধরনের মানসিক অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব। অপরপক্ষে, যিনি নিজের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন নন, অথবা সেগুলি স্বীকার করেন না, তাঁদের পক্ষে সহমর্মিতা অনুভব করা কঠিন।

পরিশিষ্ট - ৫ দেখুন।

১.১৯ অনুশীলনী - ৬

সহমর্মিতার প্রতিক্রিয়া

উপকরণ :

প্রশ্নাবলি, পেনসিল বা কলম।

পদ্ধতি :

দলটিকে ছোটো দলে ভাগ করে, প্রতিটি দলের কাছে প্রশ্নাবলি দিয়ে দিন।

নির্দেশ :

প্রশ্নাবলিতে একটি করে বক্তব্য রয়েছে এবং সেই বক্তব্যের সম্পর্কে কয়েকটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কোন্ প্রতিক্রিয়াটি সহমর্মিতামূলক তা বলতে হবে।

● বড়ো দলে ফিরে এসে প্রত্যেক দলের প্রবক্তা তাঁর দলের উত্তরগুলি জানাবেন্।

১.২০ অনুশীলনী - ৭

সহমর্মিতার প্রশ্নাবলি

উপকরণ :

ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, কাগজ, পেনসিল, হ্যান্ড আউট

পদ্ধতি :

পাঁচটি বাক্য লেখা কাগজটি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে দিন।

নির্দেশ :

কাগজে লেখা বাক্যগুলির কোন্‌টির সঙ্গো আপনি সহমর্মিতা বোধ করেন না?

● লেখা হয়ে যাবার পর উপস্থাপক আলোচনা করবেন। সময় কম থাকলে তিনি দলকে জিজ্ঞেস করতে পারেন কোন্-কোন্ বাক্যের সঙ্গো সহমর্মিতা বোধ করতে বেশির ভাগের অসুবিধে হয়েছে।

১.২১ আলোচনা

মূল বক্তব্য

মানুষের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা চেষ্টা করে সহমর্মিতা বাড়াতে পারি। এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও এটাও সত্য যে আমরা সকলের সাথে সহমর্মিতা করতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের অনুভূতি অন্য মানুষের প্রতি, বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের প্রতি বা বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতি আমাদের সহমর্মিতার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সহমর্মিতারও একটা সীমা আছে। এই ক্ষেত্রে সকলের নিজের নিজের সীমা জানা অত্যন্ত জরুরি। সহমর্মিতা আমাদের অন্য মানুষকে বুঝতে সাহায্য করে। একটা মানুষকে বুঝতে না পারলে আমাদের তার প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই কোনো মানুষের সঙ্গো যোগাযোগের ক্ষেত্রে সে কাজটা কেন করেছে, তা বোঝা প্রয়োজন। সহমর্মিতার অর্থ এই নয় যে মানুষটি যা করেছেন তা আমি সমর্থন করি। তবে সহমর্মিতা আমাদের তাকে বুঝতে সাহায্য করে।

সেই কারণে এটা জানা এবং আলোচনা করা প্রয়োজন যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমরা সহমর্মিতা করতে পারি। যেমন হয়তো তাকে আমরা অন্য কোনো লোকের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি যিনি তার কথা শুনে, বুঝে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবেন। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের কি করা উচিত সেটাও চিন্তা করা দরকার আছে, আমাদের সে দিকটাও ভাবা দরকার।

সহমর্মিতার অনেকগুলি স্তর আছে। একেবারে সহমর্মী হতে না - পারা থেকে শুরু করে, গভীর একাত্মবোধ পর্যন্ত। শেষেরটি সহমর্মিতার চরম স্তর। এই শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারা কঠিন। আমরা বেশিরভাগই পারি না। তার জন্য লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে, আমরা সহমর্মিতার স্তর উন্নত করতে পারি। যদি আমরা মন দিয়ে ব্যক্তির কথা শুনি, তার মত করে তাকে বুঝতে চেষ্টা করি, তাকে বিচার না করে বা উপদেশ না দিয়ে তার মানসিক অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা তার সহমর্মী হতে সক্ষম হব।

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহমর্মিতার গুরুত্ব অসাধারণ। বহু অপরাধমূলক কাজের পেছনে এই সহমর্মিতার অভাব কাজ করছে। যে ব্যক্তি চরম কোনো অপরাধ করছে সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পীড়িত ব্যক্তি বা তার আত্মীয়-স্বজনের সহমর্মী হতে পারে না, তাদের দুঃখ-কষ্ট সে বোধ করতে পারে না। তাই কষ্ট দেওয়া তার কাছে সহজ হয়ে যায়।

শিক্ষকের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা তাঁর ছাত্রকে বুঝতে সাহায্য করবে। ছাত্রের দুষ্টুমি বা ক্লাসে অমনোযোগিতা বা তার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তিনি তখন অন্যভাবে দেখতে পারবেন। এর ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হবে এবং শিখন প্রক্রিয়ার এক সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হবে।

১.২২ সংযোগস্থাপন

(সক্রিয়ভাবে শোনা/মন দিয়ে শোনা)

সংযোগস্থাপন একটি পদ্ধতি যেখানে কথাবার্তা এবং ভাবভঙ্গি বিনিময়ের মাধ্যমে একজন অন্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। আমাদের অনেকেরই ধারণা শুধুমাত্র কথাবার্তার মাধ্যমে সংযোগস্থাপন করা যায়। কিন্তু বাস্তবে মাত্র ৭ ভাগ সংযোগস্থাপন কথাবার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে, বাকি ৯৩ ভাগ সংযোগস্থাপন ভাবভঙ্গির মাধ্যমে হয়। ভাবভঙ্গি বলতে বোঝায়— মুখের ভাব, কণ্ঠস্বর, শরীরের অঙ্গভঙ্গি, চালচলন, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, বাচনভঙ্গি প্রভৃতি। সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই যা বলা হয় তার থেকে ভাবভঙ্গি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কেন শোনা জরুরি ?

শোনা বলতে শুধুমাত্র শুনে যাওয়া এমনটা নয়, বক্তা যা বলছে তা মন দিয়ে শোনা এবং বোঝা দরকার। মন দিয়ে শোনার দক্ষতা আমাদের চারপাশের লোকজনদের আবেগ, অনুভূতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে।

ভালো শ্রোতা হতে পারলে :

- অন্যরা নির্ভয়ে নিঃসংকোচে নিজের কথা বলতে পারে।
- শুধুমাত্র অন্যকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে এবং সেই্ কথা মন দিয়ে শুনে তার সমাধানে সাহায্য করা যায়।
- বক্তার বক্তব্য বুঝতে পারা যাচ্ছে, তা বক্তা অনুভব করতে পারবে।
- বলার সময় মাঝখানে বাধা না দিলে বা নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করলে বক্তা নিজের কথা বলার ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়।
- বক্তা বুঝতে পারবে তাকে এবং তার বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
- শোনার আরও একটি ইতিবাচক দিক হল, যার কথা ধৈর্য ধরে এবং গুরুত্ব দিয়ে শুনছি, সেও আমার কথা মন দিয়ে শুনবে এবং গুরুত্ব দেবে।
- মন দিয়ে শোনা কথা-ই মনে রাখা (স্মৃতিতে ধরে রাখা) সম্ভব হয়।

সক্রিয়ভাবে শোনা কীভাবে?

- শোনা শুধুমাত্র মন দিয়ে শোনা এমনটা নয়, সক্রিয়ভাবে শোনা দরকার অর্থাৎ বক্তার কথা মন দিয়ে শোনার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার অনুভূতিকে বোঝা এবং অনুভূতি সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া দরকার।

সংযোগস্থাপনের বিভিন্ন স্তর

গভীরতার ভিত্তিতে সংযোগস্থাপনের বিভিন্ন স্তর হতে পারে—একেবারে ওপরের স্তর বা গতানুগতিক স্তর থেকে আবেগ-অনুভূতির গভীরতর স্তর পর্যন্ত।

সংযোগস্থাপনের স্তরগুলি

১. **গতানুগতিক/ সৌজন্যমূলক (Cliche):** রাস্তায় কারও সঙ্গে দেখা হলে, তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসা বা 'কেমন আছেন?' প্রভৃতি বলা—এর মাধ্যমে বোঝানো সম্ভব যে আমি তাকে দেখেছি এবং আমার ভালো লেগেছে।

২. **তথ্যসংক্রান্ত (Factual) :** এই ধরনের সংযোগস্থাপন গতানুগতিক সংযোগস্থাপনের তুলনায় কিছুটা গভীরতর তবে তা তথ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যেমন: কটা বাজে? কটায় ট্রেন ছাড়বে প্রভৃতি।

৩. **বোধবুদ্ধি, উপলব্ধি সংক্রান্ত (Intellectual) :** এই ধরনের সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তথ্য-ই নয়, ধ্যান-ধারণা, বোধ, উপলব্ধি, মতামতের আদান-প্রদান হয়।

৪. **আবেগ/অনুভূতি সম্পর্কিত (Emotional) :** এই স্তরটিই সংযোগস্থাপনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরে আবেগ/অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। তবে এই স্তরে সংযোগস্থাপনের জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশ্বাসযোগ্যতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

নীচে কতগুলো উদাহরণ দেওয়া হল, যে ধরনের সংযোগস্থাপন নানারকম গন্ডগোল, বিভ্রান্তি, ঝগড়া তৈরি করে—

১. **মাঝপথে বাধা দেওয়া (Interruption) :**
স্মিতা : কালকে বাজারে যাওয়ার সময় ....
ইন্দ্রানী : শোন্ না আমার কাল রাত্রে জ্বর ....

২. **সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা (Establishing the truth) :**
শিক্ষিকা : মিতা, তুমি গত সাতদিন রোজই স্কুলে দেরি করে আসছ।
ছাত্রী : কিন্তু দিদি আমি তো আজ ঠিকসময়ই এসেছি। আমি যখন এলাম তখন ঘড়িতে.....

৩. **একসঙ্গে অনেকগুলো সমস্যার উল্লেখ করা (Dealing with multifaceted problem) :**
শিক্ষিকা ছাত্রীর প্রতি : তুমি তো কোনোদিনই বাড়ির কাজ করে আনো না, এদিকে ক্লাসে গন্ডগোল করছ। এরপরেও তোমাকে কিছু বলা হবে না।

৪. **'সবসময়' বা 'কখনও না' এরকম শব্দের ব্যবহার করা (Using extreme statements like 'always' and 'never') :**
শিক্ষিকা ছাত্রীর প্রতি : তুমি কোনোদিনও সময়মতো স্কুলে আস না।

৫. **খারাপ বলে ছাপ মেরে দেওয়া (Using trait names) :**
শিক্ষক ছাত্রের প্রতি : তুমি দায়িত্বজ্ঞানহীন, বাজে।

৬. **আন্দাজ করে নেওয়া বা অনুমান করা ((Guessing) :**
শিক্ষক ছাত্রের প্রতি : তুমি কালকেও মনে হয় ছাতা আনো নি।

৭. **অন্যজন কী ভাবছে তা অনুমান করে নেওয়া (Mind reading) :**
শিক্ষক ছাত্রের প্রতি : আবার তুমি ক্লাসে দেরি করে এসেছ নিশ্চয়ই বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলে।

৮. **দোষ দেওয়া (Blaming) :**
ছাত্রী : আমি এবারও অঙ্কে পাশ করতে পারলাম না কারণ পরীক্ষার আগের দিন আমার মাসতুতো বোন এসেছিল।

৯. **মুখের ভাষা ও হাবভাবের মধ্যে অসংগতি (Difference between verbal language and nonverbal language) :**

শিক্ষিকা : আমার সবসময়ই তোমাদের জন্য প্রচুর সময় আছে। (বলার সময় ঘড়ি দেখছেন।)

১০. **উচিত-অনুচিত বা ভুল-ঠিক—বলা (Judgemental statement) :**

শিক্ষক : ক্লাসে তোমার ঘড়ি পরে আসা উচিত হয়নি।

কার্যকরী সংযোগস্থাপন

- **সক্রিয়ভাবে শোনা**

যখন কারও কথা মন দিয়ে শোনা হয় তখন ভালো লাগে। যে শুনছে তাকে কাছের মানুষ মনে হয় এবং আরও কথা বলতে ইচ্ছে করে। শুধু শুনলেই কিন্তু আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। যার কথা শুনছি, নিজের হাবভাব, মাথানাড়া, চোখের দিকে তাকানো ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে বুঝতে দিতে হবে যে তার কথা শুনছি।

- **সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা**

সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললে যাকে বলা হচ্ছে তার মনে হয় তাকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বললে মনে হতে পারে যে বিষয়ে এবং যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তাতে উৎসাহের অভাব রয়েছে।

- **'আমি' শব্দের ব্যবহার**

কথার মধ্যে 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করবে। যেমন 'আমার মনে হয়......' অথবা 'আমি ভাবছি......' এই ধরনের শব্দের ব্যবহার করলে যে বলছে তার আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় যে সে নিজেই তার আচার-আচরণ বা কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে।

যেমন— ১. তুমি আমাকে দুঃখ দিলে।

২. আমি দুঃখ পেলাম যখন তুমি......।

ওপরে দুটি বাক্যের—প্রথম ক্ষেত্রে আমার দুঃখ আমার দুঃখ পাওয়ার জন্য যেন অন্য কেউ। অর্থাৎ, অন্য কেউ আমাকে দুঃখ দিচ্ছে তাকে কিছুটা দোষারোপ বা সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার দুঃখ পাওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার। এখানে, এই দুঃখ পাওয়ার জন্য কিন্তু কাউকে সরাসরি দোষারোপ করা হয়নি।

পরিশিষ্ট - ৬ দেখুন।

১.২৩ অনুশীলনী - ৮

অ-ভাষাগত সংযোগস্থাপন

পদ্ধতি :

- দুজনের ছোটো-ছোটো দল গঠন করুন।
- দুজনে পরস্পরে পরস্পরের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসবেন।
- প্রথমে একজন কথা বলবেন, তারপরে অন্যজন কথা বলবেন।
- একজন কথা বলার সময় অন্যজন নিজের মনের ভাবের দিকে লক্ষ রাখবেন।
- সময় শেষ হলে সকলে বড়ো দলে ফিরে আসবেন।

১.২৪ আলোচনা

মূল বক্তব্য

- প্রত্যেকেই অন্যের কথা শোনার সময় মনের কী ভাব হচ্ছিল বলবেন।

[যদি দলটি বড়ো হয়, তাহলে মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে অনুশীলনীটি করা যেতে পারে। বাকিরা নিরীক্ষক হিসেবে থাকবেন।]

- আমরা সাধারণভাবে যেভাবে লোকের কথা শুনি, তার তুলনায় এই পদ্ধতি কোন্ দিক দিয়ে পৃথক?
- সাধারণভাবে মুখোমুখি কথা বললে বুঝতে সুবিধে বেশি হয়, নাকি হয় না?

উপস্থাপনাকারী নিম্নলিখিত ব্যাপার আলোচনা করে অনুশীলনীটি শেষ করবেন : মন দিয়ে শুনতে হলে—

- বক্তার মুখোমুখি থাকতে হবে
- বক্তার চোখের দিকে তাকাতে হবে
- একটু নিরিবিলি জায়গা বেছে নিতে হবে
- দরকার অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে, তবে বেশি প্রশ্ন না করাই ভালো।

সক্রিয় শোনার ক্ষেত্রে আমাদের অ-ভাষাগত প্রকাশ ভঙ্গির গুরুত্ব এই অনুশীলনীর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে। আমরা যখন মুখোমুখি বসে কথা বলি, তখন বক্তা যা বলছেন তাছাড়াও তাঁর মুখের ভাব, তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, তাঁর বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক দেওয়া এবং সে সময়ে তাঁর মুখের ভঙ্গি, অঙ্গ-সঞ্চালন আমাদের তাঁর বক্তব্য বুঝতে বেশি সাহায্য করে। তাই যদি সঠিক সংযোগস্থাপন করতে হয়, তাহলে সামনা-সামনি অবস্থিত হয়ে, চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ভাষায় নিজের কথা বললে অন্যের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়।

১.২৫ অনুশীলনী - ৯

সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা

উদ্দেশ্য :

সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা

উপকরণ :

ফ্লিপ চার্ট, মার্কার

পদ্ধতি :

- বড়ো দলটিকে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ করে নিন।
- প্রত্যেক দল যে-কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। বিষয়টি উপস্থাপক ঠিক করে দিতে পারেন।

নির্দেশ :

প্রথম বক্তা বিষয়টি নিয়ে যা খুশি বলতে পারেন। তারপর যে বক্তা বলবেন তাঁকে পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্যের ঠিক-ঠিক সারাংশ আগে বলতে হবে। তারপরই তিনি নিজের কথা বলতে পারবেন।

১.২৬ আলোচনা

মূল বক্তব্য

ছোটো দল বড়ো দলে ফিরে আসার পর উপস্থাপক আলোচনার সূত্রপাত করবেন, বিশেষ করে নিম্নলিখিত ৩টি বিষয়ের উপর :

- এই অনুশীলনীতে অংশগ্রহণ কেমন লাগল?
- কী ধরনের অনুভূতি মনে জাগছিল?
- কর্মস্থলে এই অভিজ্ঞতার কিছু বা কোনো অংশ কি প্রয়োগ করা যেতে পারে?

সক্রিয়ভাবে শোনার ক্ষেত্রে অমনোযোগ ও বক্তার বক্তব্যের মধ্যে নিজের অজান্তে আমরা নিজেদের ধারণা ঢুকিয়ে দিই। এই অনুশীলনীর দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি সক্রিয়ভাবে শোনার জন্য মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু তাই নয় শোনা যে- হয়েছে তা বোঝানোর জন্য বক্তার বক্তব্য ঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে

হবে। উপস্থাপিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি বক্তার বক্তব্য উপস্থাপিত করলে তবেই বক্তা আমার বোঝার ভুল বা ত্রুটি সংশোধন করে দিতে পারবেন। সঠিকভাবে শুনলে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব এবং সংযোগস্থাপন সহজতর হবে।

১.২৭ ক্রোধপ্রশমন বা সংবরণ

(Anger-Management)

সাধারণত বিদ্যালয়স্তরে দৈহিক শাস্তিদানের মূলে থাকে ছাত্র বা ছাত্রীটির আচরণ সম্পর্কে অসন্তোষ, সেই অসন্তোষ থেকে দেখা দেয় হতাশা এবং সেই হতাশা থেকে রাগ। সেই রাগের প্রকাশই আমরা দেখে থাকি দৈহিক শাস্তিদানের মধ্যে।

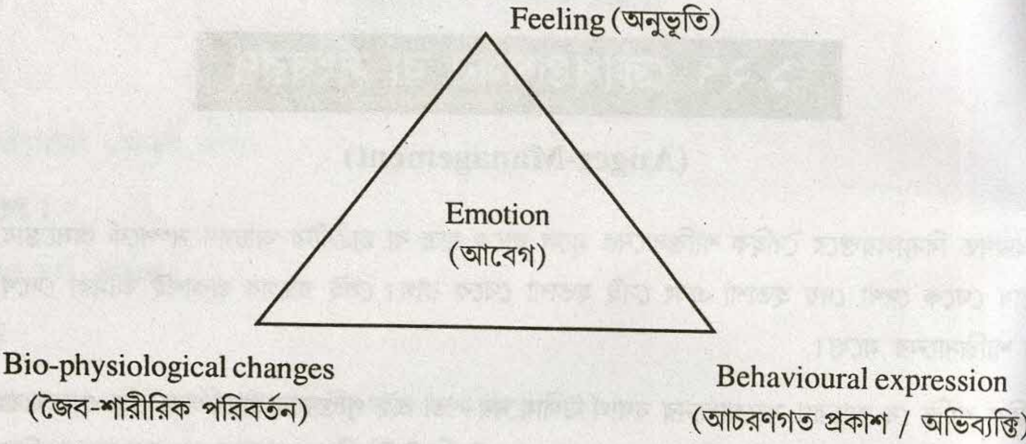
দৈহিক শাস্তি যে আচরণ সংশোধনের যথার্থ উপায় নয়—তা এই পুস্তিকায় প্রাসঙ্গিক যুক্তি ও তথ্যসহকারে আলোচিত হয়েছে। যুক্তি ও অভিজ্ঞতা থেকে অধিকাংশ শিক্ষকশিক্ষিকার কাছেও তা অজানা নয়। কিন্তু, তবু অনেক সময় নিজের হতাশা ও রাগ সংবরণ করতে না পারার কারণেও ঘটে যায় দৈহিক শাস্তিদানের নানা ঘটনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, হতাশা, রাগ প্রভৃতি আবেগ সংবরণ ও যথাযথ প্রকাশের কুশলতা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এই পুস্তিকায়।

একটা সময় ছিল, যখন মনে করা হত বুদ্ধি-ই জীবনে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এই ধারণা সাম্প্রতিককালে বদলেছে। এখন মনে করা হয় — ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, পেশাগত জীবনে, সামাজিক ক্ষেত্রে একজনের সাফল্য শুধু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে না, তা অনেকটাই নির্ভর করে সেই ব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন আবেগ (বিশেষত নেতিবাচক আবেগগুলি, যথা — রাগ, হতাশা, ঈর্ষা, উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা, অবসাদ প্রভৃতি) কতটা কুশলতার সঙ্গে সংবরণ করতে পারছেন এবং যথাযথ ও সমাজ-গ্রাহ্য পদ্ধতিতে তা প্রকাশ করতে পারছেন।

হতাশা, রাগ প্রভৃতি আবেগ প্রশমন ও যথাযথ প্রকাশের কুশলতা সম্পর্কে আলোচনার প্রথমে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন সাধারণভাবে আবেগ প্রশমন ও যথাযথ প্রকাশের (management of emotion) কুশলতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটি।

বাংলাভাষার আবেগ ও অনুভূতি — শব্দ দু'টি সমার্থক প্রায়। কিন্তু, ইংরাজী emotion এবং feeling, সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় না। Emotion-এর মধ্যেই **তিনটি** বিষয় বা component রয়েছে। এগুলি হল—



ওপরের এই চিত্রটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আবেগ-এর মধ্যেই **তিনটি** বিষয় উপস্থিত রয়েছে — অনুভূতি, জৈব-শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন এবং আচরণ।

রাগ-এর প্রেক্ষাপটে আবেগ-এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকটি আমরা একটু বুঝে নিই। রাগ — একাধারে তা আবেগ ও অনুভূতি। কোনো কারণে আমাদের রাগ হলে অনুভূতিতে তার প্রভাব পড়ে, মনের মধ্যে দেখা দেয় রাগের অনুভূতি। শরীরের মধ্যেও জৈব-শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় সেই সময়ে। অতিসক্রিয় হয়ে ওঠে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervus system), প্রচুর পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক এনার্জি (energy) উৎপন্ন হয়, দেখা দেয় শরীর ও মনে তীব্র উত্তেজনা। এই তীব্র উত্তেজনার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় আচরণের মধ্য দিয়ে। বহুক্ষেত্রেই কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না রাগের আচরণগত প্রকাশের মধ্যে। তারই প্রকাশ হয়তো বা দেখি আমরা দায়িত্ববোধহীন হঠকারী শাস্তিদানের মধ্যে।

আবেগের এই দায়িত্ববোধহীন হঠকারী প্রকাশকে সংযত করতে, রাগ প্রশমনের ও সমাজগ্রাহ্য পদ্ধতিতে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন নিজের বিভিন্ন অনুভূতি সম্পর্কে সচেতনতা তথা অন্তর্দৃষ্টি (insight) গড়ে তোলা। বেশিরভাগক্ষেত্রেই আমরা আমাদের প্রতিমুহূর্তের বিভিন্ন অনুভূতি সম্পর্কে তেমন সচেতন থাকি না। অনুভূতিকে আমরা চিনি কোনো বিশেষ নামে বা শব্দে (যেমন — দুঃখ, অভিমান, ক্ষোভ, হতাশা, রাগ, ভয়, আনন্দ, তৃপ্তি, প্রশান্তি প্রভৃতি)। আমরা কি সত্যিই আমাদের সারাদিনের সমস্ত অনুভূতিগুলোকে বিশেষ কোনো শব্দে বা নামে চিনতে পারি? — এই প্রশ্ন নিজেদের করে দেখতে পারি আমরা। বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতিকে যদি আমরা চিনতে না পারি তাহলে তাকে প্রশমন কীভাবে করবো? আর, তার যথাযথ প্রকাশই বা কীভাবে সম্ভব হবে? আবেগ-অনুভূতিকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ সমাজ-গ্রাহ্য পদ্ধতিতে প্রকাশের কুশলতা (skill) নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে রপ্ত করাটাও বিশেষভাবে জরুরি।

সারাদিনে আমরা যতরকমের আবেগ-অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাই, তার খুব অল্পই যথার্থভাবে প্রকাশ পায়, বেশিরভাগ আবেগ-অনুভূতিই অবদমিত হয় আমাদের মনের মধ্যেই। অবদমিত অনুভূতিগুলি সঞ্চিত হতে থাকে মনের মধ্যে। প্রেসার কুকারে রান্নার সময় আমরা দেখি, নির্দিষ্ট কিছু সময় পেরোনোর পর কুকারের মধ্যে বাষ্পের যে চাপ ঘনীভূত হয়, একসময় তা সজোরে হুইস্‌লের শব্দ সৃষ্টি করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু, যদি এই বেরোনোর পথ বন্ধ থাকতো! সেক্ষেত্রে কী পরিণতি হত তা সহজেই অনুমান করতে পারি আমরা! অবদমিত আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সুতরাং, বিভিন্ন আবেগগুলিকে এবং তার অনুভূতিগুলিকে চিনতে শেখার পাশাপাশি জরুরি সেগুলিকে সমাজ-গ্রাহ্য পদ্ধতিতে দায়িত্ববোধের সঙ্গে প্রকাশ করতে শেখাও। মনের মধ্যে অবদমিত পুঞ্জীভূত বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি কখনও তীব্র রাগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। কখনও বা দেখা দেয় উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা-বিষণ্ণতা প্রভৃতি মনের অসুখ, কখনও হয়তো শারীরিক নানা উপসর্গের (Somatoform Disorders) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। অবদমিত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত মাধ্যমে। বেশিরভাগক্ষেত্রেই নেতিবাচক বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতির অবদমিত প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় তুলনামূলকভাবে দুর্বল কারও ওপর। অন্য কারও ওপর জমে থাকা অসন্তোষের শিকার হয়ে যায় অনেকক্ষেত্রে সামান্য কোনো অপরাধ বা ভুল করে ফেলা ছাত্র বা ছাত্রীটি।

মনের মধ্যেকার সারাদিনের নানান আবেগ-অনুভূতি যদি কারও কাছে নির্দ্বিধায় বলতে পারা যায়, তাহলে অনেকটাই প্রকাশ পেতে পারে মনের নানান অনুভূতি, হাল্‌কা হয় তাতে মন। বিভিন্ন অনুভূতি লিখে রাখাটাও প্রকাশের একটা কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে।

নেতিবাচক আবেগ প্রশমনে বা সংবরণে রাগের কারণটির যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। কোনো ঘটনার পরে সেই ঘটনার সম্পর্কে আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার জগতে শুরু হয় বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলে অত্যন্ত দ্রুত। এই বিশ্লেষণের ধরণই স্থির করে দেয় — আমাদের মনে (সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে) নেতিবাচক কোনো আবেগ তৈরি হবে না, ইতিবাচক!

এই পুস্তিকার পরিশিষ্ট অংশে 'শাস্তি সম্পর্কে কিছু কথা' শীর্ষক লেখাটিতে দৈহিক শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন শিক্ষকশিক্ষিকার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। এই প্রশ্নগুচ্ছ ছাত্র বা ছাত্রীর অপরাধের সাপেক্ষে শিক্ষকশিক্ষিকার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত অন্তর্দৃষ্টি তৈরিতে একটি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধ থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

"তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজেদের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা

ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া বা তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব।... ছেলেদের কঠিন দন্ড ও চরম দন্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তারা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতার দ্বার নিজেদের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।"

ক্লাসে শিক্ষক পড়াচ্ছেন। পেছনের বেঞ্চে দুটি ছাত্র পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে এবং হাসাহাসি করছে। শিক্ষক একবার বারণ করলেন, ছাত্ররা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথা বলতে ও হাসাহাসি করতে লাগল। শিক্ষক দেখলেন এবং অমনোযোগী ছাত্রদের উঠে আসতে বললেন। ছাত্ররা উঠলো না। শিক্ষকের রাগ বাড়তে থাকলো। ক্রোধ প্রশমন করতে হলে কী করবেন?

১. শিক্ষক নিজে কি বুঝতে পারছেন, তাঁর রাগ হচ্ছে? **"আমার রাগ হচ্ছে"** একথা বুঝতে পারলে আপনিই রাগের মাত্রা কিছুটা কমে যাবে। 'আমার রাগ হচ্ছে' — এটা বুঝতে পারার জন্য নিজের মানসিক অবস্থা থেকে আমাকে একটু বিযুক্ত হয়ে, নিরীক্ষক বা Observer-এর ভূমিকায় যেতে হচ্ছে। এই সামান্য বিযুক্তিই রাগ অনেকক্ষেত্রে প্রশমিত করতে পারে।

২. **গভীর নিশ্বাস নেওয়া বা deep breathing :** এটি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থারূপে অত্যন্ত উপযোগী। মনে রাখতে হবে গভীর নিশ্বাস নেওয়ার অর্থ হল বুক থেকে না টেনে একেবারে পেট থেকে টেনে নিশ্বাস নেওয়া। অন্তত ১০ বার এরকমভাবে নিশ্বাস নিলে, রাগ প্রশমিত হয়, দেখা গেছে।

৩. খুব আস্তে নিজেকে শান্তি দেবার মত শব্দ উচ্চারণ করতে হবে, যেমন, **"শান্ত হও"**, **"সহজ হও"**, **"সহজভাবে ঘটনাটিকে নাও"**। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই কথাগুলি নিজেকে বলতে থাকলে রাগের প্রশমন হয়।

৪. মনে মনে খুব শান্তিদায়ক কোনো দৃশ্যের কথা কল্পনা করুন। দৃশ্যটি পুরোপুরি স্মৃতি থেকে হতে পারে অথবা স্মৃতি আর কল্পনা মিশিয়েও হতে পারে।

৫. যে স্থানে ক্রোধ-উদ্রেককারী ঘটনা ঘটছে সেখান থেকে কিছু সময়ের জন্য সরে যান। শিক্ষক প্রয়োজন বোধ করলে কিছুক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে এলে আবার কক্ষে ফিরে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন।

৬. নিজের চিন্তা-পদ্ধতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে। আমরা অনেক সময় রাগের ক্ষেত্রে সব বিশেষণে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করি আর অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। যেমন, রাগের সময় আমরা বলি, **"কী সাংঘাতিক! এমন কাণ্ড করল!"** অথবা **"এরকম কাণ্ড জীবনে কখনও দেখিনি।"** ইত্যাদি। এই ধরনের চিন্তা-পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। আপনি ভাবতে পারেন — "ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়েছে। হওয়া উচিত হয়নি। যাই হোক, মাথায় আকাশ তো ভেঙে পড়েনি, ইত্যাদি। নিজেকে মনে করান, রাগ করে সমস্যার

সমাধান করা যাবে। আপনার শারীরিক বা মানসিক স্থিতিও এর ফলে ভালো তো হবেই না, বরং খারাপই হবে। নিজেকে বোঝান সারা পৃথিবী আপনার ক্ষতি করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেনি।

৭. **যুক্তি :** একটু শান্ত হলে যুক্তির প্রয়োগ করুন। যুক্তির দ্বারা আপনার রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। প্রতেক বার যখন আপনার রাগ হয়, নিজেকে বলুন, "লোকে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে না। একটু পরিস্থিতি খারাপ যাচ্ছে এই যা।" যুক্তি দিয়ে দেখলে সব রাগের কারণ হল আমি নিজে যা চাই, তাই হোক — এরকম একটা দাবির মনোভাব। সে চাওয়া হয়তো যুক্তিসঙ্গত, যেমন আমরা চাইতে পারি অন্য মানুষ আমার কথা বুঝবে, সমাজে অন্যায় কেন থাকবে বা আমার প্রতি অন্যায় কেন করা হবে, ইত্যাদি। কিন্তু আমার চাহিদা যুক্তিসংগত হলেও তা মিটবে এই দাবি অবাস্তব। আমি যদি বলি, "আমার ইচ্ছে করে, এরকম এরকম হোক, " তাহলে রাগ হবে না, কিন্তু যখন বলি, "আমি যা চাই, তা হতেই হবে", তখনই সমস্যা তৈরি হয়। সুতরাং যুক্তি দিয়ে আপনাকে জগতে আপনার প্রকৃত অবস্থান বুঝতে হবে। রাগের মাত্রা তাহলে কমে যাবে।

৮. **রসবোধ বা Sense of humour :** এটি রাগের পরিস্থিতিকে হালকা করে দিতে সাহায্য করে। অনেক সময় রাগের কারণ সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। রাগ আমাদের পুরোপুরি বিনষ্ট হবে না, হওয়া হয়তো উচিতও নয়, তবে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

রাগ একটি আবেগ। প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর রাগ থাকে।

কিন্তু রাগ যখন খুব ঘনঘন ভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, তখন তা একটি অসংগত স্বভাবে পরিণত হয়।

তাই কোন্ ঘটনা আমায় ক্রোধান্বিত করছে তার স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

উদ্দেশ্য :

যেহেতু ক্রোধ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তাই ক্রোধ প্রশমনের ইচ্ছা ও উপযুক্ত পদ্ধতির অবলম্বন নেওয়া প্রয়োজন।

ক্রোধ প্রশমন পদ্ধতি :

রাগের চিহ্নগুলি প্রকাশিত হচ্ছে বুঝতে পারলে—

(১) কিছুক্ষণের জন্য সেই জায়গা থেকে সরে যাওয়া।

(২) অন্য কাহারও সাথে কথা বলা।

(৩) শ্রেণিকক্ষে হলে, অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা।

(৪) যে কারণে রাগের চিহ্ন তৈরি হচ্ছে সে বক্তব্য না রেগে বলা। ছাত্রকে করণীয় পথটি বলে দেওয়া।

(৫) ক্রোধদমনের অস্বস্তি ভেতরে থাকলেও, অস্বস্তি নিয়ে চলতে শেখা, সহিষ্ণুতা বাড়ানো। পরে যথাযথ মোকাবিলা পদ্ধতির চেষ্টা করা।

নিজের মূল্যায়ন :

রাগ কেন করছি?

↓

ছাত্রের ব্যবহার সংশোধনের জন্য।

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা :

ছাত্রের ব্যবহার সংশোধিত হয়েছে?

যেমন—

১	২
ছাত্র দুষ্টুমি করছে।	ছাত্র দুষ্টুমি করছে।
ছাত্রকে মারলাম।	ছাত্রকে বোঝালাম।
ছাত্র পরেরদিন থেকে শান্ত হয়ে বসল।	ছাত্র পরের দিন থেকে শান্ত হয়ে বসল।

১ ও ২ ঘটনায় ছাত্রের মানসিক অবস্থার তফাত আছে?

আলোচনা :

কী তফাত এবং কেন?

রাগ প্রশমনের চিন্তাভিত্তিক সমাধানের জন্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

ঘটনাটি কী?

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ধারণা কী?

পরিণতি কী?

ধারণা সম্বন্ধে নিজের সাথে আলোচনা—

ঘটনা	**ধারণা**	**পরিণতি**
ছাত্রের কথা না শোনা	আমায় অসম্মান করছে	মারধোর করা বা অবাঞ্ছিত ভাষায় বকাবকি করা।

নিজের সাথে আলোচনা :

১. সে কি শুধু আমার সাথেই এরকম ব্যবহার করে না অন্যের সাথেও করে?

২. যদি অন্যের সাথেও করে, এটাই কি তার স্বাভাবিক ব্যবহার?

৩. আমার সাথে কি ব্যক্তিগত বিরোধ তার আছে?

..........ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত—

- ছাত্রের ব্যবহারে পরিবর্তন

- নিজের ব্যবহারে পরিবর্তন
- নিজের ধারণা (এখানে অপমানিত বোধ করা) অমূলক হলে, তার পরিবর্তন।

লক্ষ রাখা, ধারণার পরিবর্তন—অনুভূতি—আবেগের পরিবর্তন—ব্যাবহারিক পরিবর্তন।

আগ্রাসনমূলক মনোভাব :

মনোভাব যা অন্যকে আঘাত করে।

এই মনোভাবের দ্বারা অন্যের কাছে যে সংবাদ পৌঁছায়, তা হল—

'আমি সঠিক তুমি ভুল।'

'আমি বড়োমাপের, তুমি

ছোটো মাপের মানুষ'

↓

অন্য লোকে ভয়ে মান্য করে।

অপ্রতিরোধী মনোভাব :

নিজের মনোভাব নিজের মধ্যে রেখে, নিজের মূল্যে অন্যকে মান্য করা।

মনোভাবের সংবাদ যা অন্যের কাছে পৌঁছায়—

'আমি ভুল তুমিই ঠিক'

আমি ক্ষুদ্র, তুমি বড়ো'।

আত্মসম্মানবোধ কমে যায়, অন্যের কথা মুখ বুজে মেনে চলে।

আত্মপ্রত্যয়মূলক পদ্ধতি :

মতামত, অনুভূতি, আবেগ যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। লক্ষ রাখতে হবে তা যেন অন্যের অধিকার খর্ব না করে বা সম্মানবোধে আঘাত না দেয়।

মনোভাবের সংবাদ যা অন্যের কাছে পৌঁছায়—

'তোমার আমার মতামতের মধ্যে বা দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকতে পারে।'

↓

তুমি তোমার চিন্তা/ ব্যবহার ব্যাখ্যা করো।

আমি আমার চিন্তা/ ব্যবহার ব্যাখ্যা করছি।

↓

যৌথ সিদ্ধান্ত

↓

সিদ্ধান্ত মানার তাগিদ ভিতর থেকে আসে।

↓

অনুভূতি/আবেগ যুক্তিনির্ভর হয়।

আগ্রাসনমূলক মনোভাব জোরদার হয় কেন? (Reinforcement)

আমরা সাধারণত শিশুকে যত সহজে রাগ দেখিয়ে ফেলি, অন্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে অত সহজে রাগ দেখাই না। কারণ,

- শিশু বা ছাত্র আমাদের থেকে বয়স, শক্তি বা অবস্থানে একটু নীচের স্তরে থাকায় তাদের থেকে সোজাসুজি রাগের প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা কম।
- শিক্ষকের অবস্থান ছাত্রের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক জায়গায় থাকে। তাই ছাত্রের অসহায়তাবোধ বেশি।
- ছাত্রের থেকে প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা কম।
- শিক্ষকের ব্যবহার সাধারণত বেশি যৌক্তিক বলে সবাই মনে করে এবং ছাত্র দোষী সাব্যস্ত হয়।
- ছাত্রের কোনো দোষ বা অসুবিধাজনক ব্যবহার থাকে না, তা নয়।
- তবে সেই ব্যবহার ও শিক্ষকের রাগের মাত্রার তারতম্য হয়ে গেলে—অসুবিধা হয়, তাও শিক্ষকের পক্ষেই যায়।

১.২৮ অনুশীলনী - ১০

রাগের অভিব্যক্তি চিহ্নিতকরণ

উদ্দেশ্য :

রাগের অভিব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং নিজের ক্রোধের সম্ভাব্য অভিব্যক্তির বর্ণনা।

উপকরণ :

(১) রাগের বিভিন্ন রকম প্রকাশযুক্ত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি ;

(২) নিজস্ব কাগজ ও কলম।

ধাপ :

অংশগ্রহণকারীদের ছবিগুলোর ভাব বা অনুভূতি নির্ণয় করতে হবে।

আলোচনা :

অনুশীলনীর পরে আলোচনার সময় যদি রাগযুক্ত ছবির সঠিক নিরূপণ না করে থাকেন, তাহলে সেগুলো চিনিয়ে দেওয়া যায়।

যেগুলি ক্রোধযুক্ত ছবি সেগুলির সঠিক নিরূপণ না হলে-চিনিয়ে দেওয়া রাগ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

উপকরণ—অভিব্যক্তির ভাগগুলি বলে দেওয়া।

(১) দৈহিক

(২) ব্যাবহারিক

(৩) আবেগগত

(৪) চিন্তাগত

পরিশিষ্ট - ৭ দেখুন।

১.২৯ অনুশীলনী - ১১

রাগের অভিব্যক্তি চেনা ও নিয়ন্ত্রণ

উপকরণ :

ব্ল্যাকবোর্ড

চক

ডাস্টার

চার্ট পেপার

ভূমিকা :

রাগ বা ক্রোধপ্রদর্শন প্রত্যেক মানুষেরই এক স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশের সুস্থতাই সমাজের কাম্য। অনিয়ন্ত্রিত রাগ এক ভয়ংকর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমাদের আবেগ/অনুভূতির প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া চেনা ও জানা জরুরি।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল কীভাবে আমরা আমাদের অনুভূতিগুলির সঠিক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে নিজেদের অনুভূতির অবাঞ্ছিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

নির্দেশ :

১. বড়ো দলটিকে ছোটো-ছোটো কয়েকটি দলে ভাগ করুন।

২. তাদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দিন :

বিদ্যালয়ে মনে রাখার মতো শেষবার আপনার যে রাগ হয়েছিল সেটা মনে করুন এবং সেই প্রেক্ষিতে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন :

- রাগের পটভূমিকা কী ছিল?

- সেসময়ে আপনি কী কী শারীরিক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন?
- সেসময়ে আপনি কী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন?
- তখন মাথার মধ্যে কী ধরণের ভাবনা-চিন্তা চলছিল?
- আর একবার এই ঘটনা ঘটলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী একই হবে, নাকি অন্য ধরনের হবে?
- যদি অন্য ধরনের হয়, তাহলে কেন এই পরিবর্তন?

৩. দলের প্রত্যেকে নিজের নিজের উত্তর আলাদা ভাবে লিখবেন। লেখা শেষ হয়ে যাবার পর তারা নিজে মধ্যে আলোচনা করবেন।

৪. অনুশীলনী শেষ হবার পর সবাই বড়ো দলে ফিরে আসবেন।

অনুশীলনীর শেষে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য বোর্ডে বা চার্টপেপারে লিখে টাঙানো যেতে পারে। প্রতিটি দলের দুজনের বক্তব্যের মূল কথা বোর্ডে বা চার্টে লিখে রাখুন। বোর্ডে বা চার্টে লেখা তালিকা ধরে এবার দেখান কীভাবে তিনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করবেন, যেমন, তিনি যদি বুঝতে পারেন তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তখনই তিনি নিজেকে সামলে নেবেন। তিনি বিষয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, সে স্থান ছেড়ে খানিকক্ষণের জন্য বাইরে চলে যেতে পারেন, ইত্যাদি।

১.৩০ আলোচনা

মূল বক্তব্য

রাগ আমাদের একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। এটি একটি প্রাথমিক আবেগ এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে-কোনো আবেগের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। সেদিক দিয়ে রাগ আমাদের আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। বহু ক্ষেত্রে আমাদের কনিষ্ঠরা আমাদের রাগের মুখোমুখি হয় এবং তার ফলাফল খুব সন্তোষজনক হয় না। রাগের উন্মেষের সঙ্গে প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়া আর কিছু জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা যুক্ত থাকে। আমরা যদি সেগুলোকে চিনতে পারি, তাহলে হয়তো রাগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগেই আমরা সে সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করতে পারি।

পরিশিষ্ট - ৮ দেখুন।

১.৩১ মানসিক চাপের নির্ণয় ও প্রতিকার

যখন মোকাবিলা করার ক্ষমতার চেয়ে বাইরের দাবি একজনের ওপর বেশি হয়ে যায়, তখনই ব্যক্তি মানসিক চাপ অনুভব করে।

দাবি > মোকাবিলা করার ক্ষমতা—চাপ।

দাবি < মোকাবিলা করার ক্ষমতা— সুরক্ষিত।

যেহেতু বাইরে থেকে আসা দাবি শুধু চাপের নির্ণায়ক নয়, একজনের দাবি মোকাবিলা করার ক্ষমতা চাপের মাত্রা ঠিক করে, সেইজন্য দুই ব্যক্তির একই ঘটনায় চাপের অনুভূতি বিভিন্ন হতে পারে এবং একই ব্যক্তি ঘটনা মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, চাপের অনুভূতি কমিয়ে ফেলতে পারেন।

একজন যদি একটি সম্পর্ক বা ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত মনে না করেন, তাহলে বিষয়টি নঞর্থক হলেও, মানসিক চাপের অনুভূতি হয় না বা কম হয়।

সুতরাং, যে বিষয় নিয়ে আমরা চাপে থাকি, তা আমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং সাধারণত, চাপবোধ নঞর্থক আবেগের সঙ্গে যুক্ত।

মনে রাখতে হবে :

খুব বেশি কাজ, উৎকণ্ঠা, রাগ যেমন চাপের অনুভূতি আনে, ক্ষমতার তুলনায় খুব অল্প কাজ, গতানুগতিক জীবনধারা, হীনম্মন্যতাবোধ, বিষণ্ণতাও তেমন চাপেরই ইঙ্গিত দেয়। এই চাপ শুধু মানসিক বিপন্নতাই নয়, আমাদের দৈহিক ক্ষেত্রে ভাঙন এনে দৈহিক ও মানসিক অবসন্নতার দিকে নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন রকম অসুস্থতা নিয়ে আসে।

মানসিক চাপ বা স্ট্রেসের ফলে আমাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নানান্‌ভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে স্ট্রেসের যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি হল :

ক) উচ্চ রক্তচাপ

খ) হৃৎযন্ত্র সম্পর্কিত সমস্যা

গ) পাচনজনিত সমস্যা

ঘ) মস্তিষ্কের স্ট্রোক

ঙ) বিভিন্ন ধরনের Psychosomatic অসুস্থতা

চ) পেপ্‌টিক আলসার (Peptic ulcer)

ছ) ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (Irritable Bowel Syndrome)

জ) ডায়াবিটিস

প্রায় সব মানসিক অসুস্থতার প্রকাশের ক্ষেত্রেই মানসিক চাপের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সঙ্গে স্ট্রেসের যোগাযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক) বিষাদ ও তৎসহ আত্মহত্যার প্রবণতা

খ) অনিয়ন্ত্রিত রাগ

গ) মাদকদ্রব্যে আসক্তি

ঘ) প্যারানোইয়া (Paranoia)

ঙ) আমাদের কাজ ও সম্পর্কগুলির উপর নেতিবাচক প্রভাব

সুতরাং সুস্থ সম্পর্ক ও সুস্থ জীবনের জন্য মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে আনা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই কাজের জন্য আমাদের সব থেকে আগে জানতে হবে স্ট্রেসের উৎস কী? স্ট্রেসের ৬টি উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল ঃ

১. পরিবেশগত :

ক) **পরিবার** — পারিবারিক পরিস্থিতি, সম্পর্ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি স্ট্রেসের বা মানসিক চাপের উৎস হতে পারে।

খ) **কর্মস্থল** — কাজের ধরণ, কাজের Shift, যাতায়াতের ব্যবস্থা, কর্তৃত্বের অভাব, কাজ করার মত উপযুক্ত স্থানের অভাব ইত্যাদি।

গ) **বাস্তব পরিবেশ** — আপনার বসবাস বা কর্মের পরিবেশে যদি বেশি শব্দ হয়, দূষণ বেশি হয় তাহলেও স্ট্রেস বা মানসিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে।

২. শরীর সংক্রান্ত :

দৈহিক স্বাস্থ্য স্ট্রেসের বড়ো কারণ হতে পারে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের কোনো সমস্যা, ডায়াবিটিস বা বাত (যা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক) অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে, তাঁরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি মানসিক চাপ বা স্ট্রেস অনুভব করেন।

৩. ব্যক্তিত্বজনিত :

আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন —

i) আপনি যদি A type ব্যক্তিত্বের লোক হন— A type ব্যক্তিত্বের লোকেরা অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। জীবনে উন্নতি করার লক্ষ্যে তারা প্রবল কর্মোদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে।

ii) নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকা— এঁরা কেবল নিজের কথা ভাবেন, কে তাঁদের মান দিল, কি অপমান করল ইত্যাদি নিয়ে সব পরিস্থিতি আর সব ঘটনা বিচার করেন। এঁদের ক্ষেত্রে মানসিক চাপের মাত্রা বেশি হয়ে যায়।

iii) উদ্‌বেগপ্রবণ— কিছু - কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা খুব বেশি উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠায় ভোগেন। বাড়ির কেউ কাজে বেরিয়েছেন, যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসছেন, তাঁরা স্বস্তি পান না। প্রতিটি ছোটোখাটো ব্যাপারে তাঁরা উদ্‌বেগ অনুভব করেন।

৪. আচরণগত :

i) **কার্য-সম্পাদনে অপটুতা (Inefficient work-habits) :** গুছিয়ে কাজ করতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য সম্পাদন করা যায়। তেমনি কর্মকর্তার যদি গুছিয়ে দ্রুত কাজ করার অভ্যাস না থাকে, তাহলে অসমাপ্ত কাজের দীর্ঘ তালিকা যথেষ্ট মানসিক চাপের কারণ হতে পারে।

ii) **সময় ও কাজের সামঞ্জস্য স্থাপনের অভাব (Lack of time management) :** আমাদের কাজ ও কর্তব্যের কোনো সীমারেখা টানা হয়নি কিন্তু সময়ের এক নির্দিষ্টসীমা আছে, যেমন সকাল ছটায় দিন শুরু হয়ে সন্ধে ছটায় দিন শেষ হবে। আমার অসংখ্য আর অগণিত কাজ থাকতে পারে কিন্তু আমাকে সবই ওই সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হাতে যে সময়টা আছে তার দক্ষ ও সুষ্ঠু ব্যবহার। আমরা আমাদের সময়কে দক্ষভাবে ব্যবহার করে আমাদের নির্ধারিত কাজ যদি শেষ না করতে পারি তাহলে আবারও অসমাপ্ত কাজের দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকা তালিকা প্রবল মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

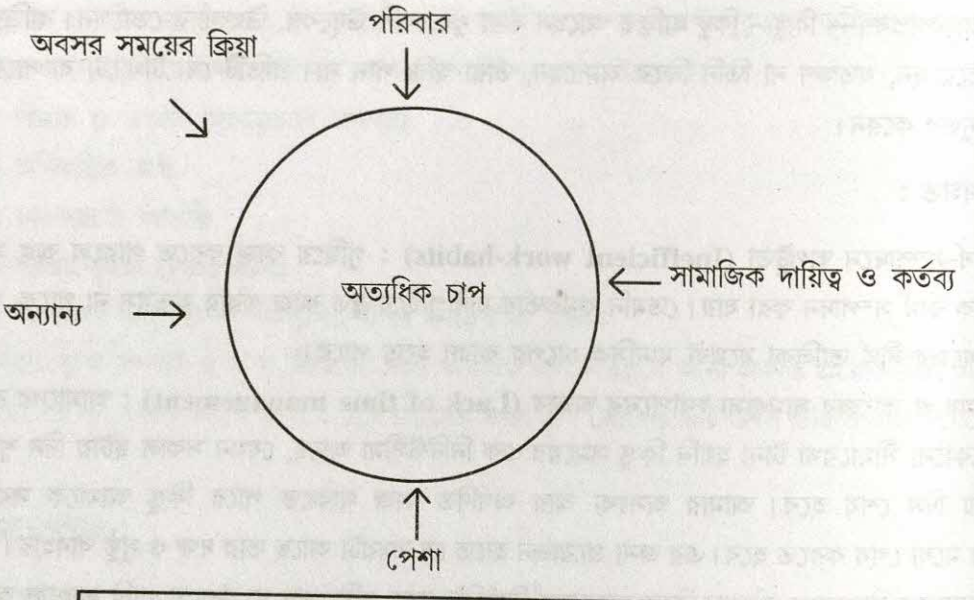
৫. অনুভূতিগত :

অনেক সময় মানসিক চাপের কারণ আমাদের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। যেমন, কেউ কেউ কাজের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। কারও কাছে সাহায্য চাইবেন না। ভাবেন, সাহায্য চাইলে ছোটো হয়ে যাবেন। সুতরাং সব দায়িত্ব নিজেই সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। দায়িত্বভার বেশি হলে এ ধরনের মনোভাব যথেষ্ট মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

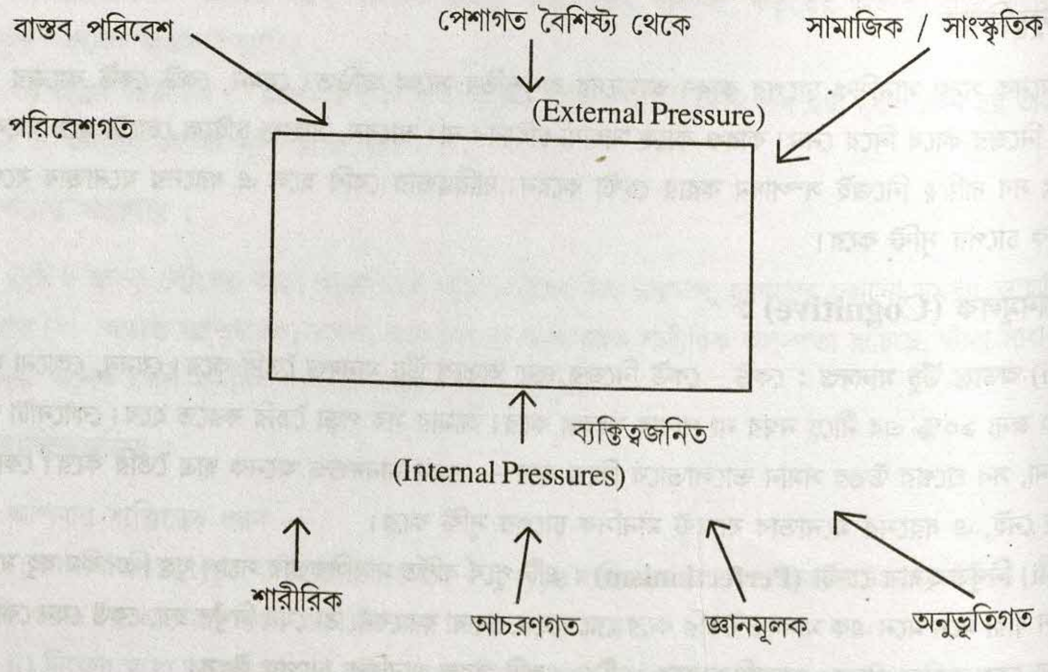
৬. জ্ঞানমূলক (Cognitive) :

(i) **অত্যন্ত উঁচু মানদণ্ড :** কেউ - কেউ নিজের জন্য অত্যন্ত উঁচু মানদণ্ড তৈরি করে। যেমন, কোনো ছাত্র নিজের জন্য ৯০% এর নীচে নম্বর না পাবার সংকল্প করে। আমার সব পড়া তৈরি করতে হবে। কোনোটা বাদ যাবে না, সব প্রশ্নের উত্তর সমান ভালোভাবে দিতে হবে — এমন মানদণ্ডও অনেক ছাত্র তৈরি করে। কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের মনোভাব যথেষ্ট মানসিক চাপের সৃষ্টি করে।

(ii) **নিখুঁত হবার চেষ্টা (Perfectionism) :** এটি পূর্বে বর্ণিত মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত। এরকম বহু মানুষ আছেন যাঁরা মনে মনে এক মানদণ্ড তৈরি করে রেখেছেন, যে যা করবেন, তা যেন নিখুঁত হয়, কেউ যেন কোনো ত্রুটি না বের করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে, এটিও একটি প্রবল মানসিক চাপের উৎস।



জ্যাকলিন অ্যাট কিনসনের "Coping with Stress at work" থেকে উদ্ধৃত।



জ্যাকলিন অ্যাট কিনসনের "Coping with Stress at work" থেকে উদ্ধৃত।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে চাপের সব কটি কারণই শেষ পর্যন্ত মানসিক কারণ। বেশিরভাগ stressor ই ভালো বা মন্দ কোনটাই নয়। কোনো বিশেষ অবস্থাকে আমি কীভাবে প্রত্যক্ষ করছি তার উপর নির্ভর করছে ওই বিশেষ অবস্থাটি stressor কি - না। একই পরিস্থিতি কারও কাছে চাপের উৎস বা stressor, আবার কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে অনায়াসে কাজে নেমে পড়ে।

মানসিক চাপ ঃ প্রতিকার ও সমাধান

ক্রমবর্ধমান ছাত্র-সংখ্যা, পঠনপাঠন প্রভৃতি বিদ্যালয়-সংক্রান্ত চাপের বাইরেও রয়েছে পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-উদ্ভূত নানা চাপ। পণ্যবাদের রমরমা বাড়িয়ে চলেছে নিরন্তর নানা চাহিদা। সেই চাহিদা সমাজের অন্য অংশের মতো শিক্ষকশিক্ষিকার মনেও প্রভাব ফেলছে। ব্যক্তিগত ও পরিবার-জীবনের নানাবিধ টানাপোড়েনও অনেক শিক্ষকশিক্ষিকার মনেই তৈরি করছে অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা Stress.

Stress বা মানসিক চাপ আমাদের জীবনযাপনের অঙ্গ। যে-কোনো কাজ করার জন্য বা লক্ষ্যে পৌঁছোতে মানসিক চাপ বা Sress-এর ভূমিকা অপরিহার্য। মানসিক চাপ না থাকলে কোথাও পৌঁছোনোর কোনো তাগিদও থাকে না, আর তাগিদ না থাকলে থাকে না কোনো প্রস্তুতিও। কিন্তু, নির্দিষ্ট একটি মাত্রা অতিক্রম করার পর প্রয়োজনীয় চাপ (enustress) ক্ষতিকর চাপ (distress) -এ রূপান্তরিত হয় — যা ক্ষতি করে সবঅর্থেই।

মানসিক চাপ বা stress নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে পরে দেখা দেয় বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি দিয়ে নিজের distress-কে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষকশিক্ষিকা যাতে নিজের অতিরিক্ত ও ক্ষতিকর মানসিক চাপ সনাক্ত করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে কিছু লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হল—

শারীরিক ঃ

বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা, ঘামতে থাকা, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা, পেশিতে টানধরা, মাথা যন্ত্রণা, ঘুমে অসুবিধা, খিদে স্বাভাবিক না থাকা, অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ করা প্রভৃতি।

মানসিক ঃ

অত্যধিক দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা, একটুতেই বিরক্তি ও রাগ, কাজে মনঃসংযোগ করতে অসুবিধা, প্রয়োজনীয় কাজ বা কথাও ভুলে যাওয়া,কিছু করতে ইচ্ছে না করা প্রভৃতি।

এই লক্ষণগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি যদি বেশ কয়েকদিন ধরে কারও মধ্যে দেখা দিতে থাকে এবং কাজকর্মের ওপর, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর এবং নিজের মনের ওপর যদি তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে এসব অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণেই।

অতিরিক্ত মানসিক চাপ অনেক সময় দুর্বল কারও ওপর বিশেষত ছাত্রছাত্রী ও সন্তানের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে প্রয়োজন নিজের জীবনযাপনের দর্শন ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কিছু বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন। এখানে আমরা কয়েকটি দিক উল্লেখ করছি।

১. মানসিক চাপের উৎস সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। চাপ থেকে বেরোনোর জন্য বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে অতিরিক্ত চাপ থেকে বেরোনোর পদ্ধতি স্থির করা এবং সেই অনুযায়ী উদ্যোগ নেওয়া। বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্রটিকে গ্রহণ করা।

২. বাস্তবসম্মত লক্ষ্য স্থির করা। অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা না করে নিজের সামর্থ্য সীমাবদ্ধতাকে বিশ্লেষণ করে নিজের লক্ষ্য স্থির করা।

৩. নিজের সামর্থ্যের এবং অতীত-সাফল্যের ভিত্তিতে নিজের ওপর আস্থা রাখা।

৪. আগের দিন রাতেই পরের দিনের সমস্ত কাজ সময় অনুযায়ী করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা। নিজের Note book-এ লিখে রাখা। সেই অনুযায়ী পরের দিন পর্যায়ক্রমে কাজগুলি করা।

৫. সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব নেওয়া। অতিরিক্ত কাজ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের অসুবিধার কথা নম্রভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করা।

৬. বন্ধুদের একটা জগৎ গড়ে তুলে তাদের সঙ্গে অবসর সময় কাটানো, নিজের আবেগ-অনুভূতি-সমস্যা নিয়ে কথা বলা, একসঙ্গে কখনও বা বেড়ানো (সম্ভব হলে সপরিবারে), নানাবিধ খেলাধুলা / সাংস্কৃতিক কাজকর্মে / সৃজনশীল চর্চার মাধ্যমে নিজের মনের যত্ন নেওয়া।

৭. পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর আহার গ্রহণ ও জল পান, প্রয়োজনমতো বিশ্রাম ও ঘুমও একান্তভাবে জরুরি।

৮. ধূমপান ও কোনো ধরনের মাদক দ্রব্য অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমানোর পরিবর্তে তা আরও অনেক সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে।

৯. নিয়মিত ব্যায়াম (ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, একটু জোরে হাঁটা, যোগাসন প্রভৃতি), প্রাণায়াম / ডীপ ব্রীদিং এক্সারসাইজ বা গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন — অতিরিক্ত মানসিক চাপ কমানো বিশেষ কার্যকরী।

১.৩২ অনুশীলনী - ১২

★ মানসিক চাপ ও ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য :

(১) মানসিক চাপের উৎস নির্ণয়।

(২) তার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিবেচনার শিখন।

উপকরণ :

(১) একটি বৃত্ত।
(২) নিজস্ব লেখার কাগজ।
(৩) দুইটি ভিন্ন রঙ-এর কলম।

ধাপ :

১। অংশগ্রহণকারীকে একটি দিন বা সপ্তাহের কথা মাথায় রেখে মানসিক চাপের উৎসগুলির একটি তালিকা করতে হবে।

২। অংশগ্রহণকারীকে একটি করে বৃত্ত প্রদান এবং চাপের উৎস নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিভুক্তকরণ—

(ক) যে চাপগুলি নিজে নিজেই মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি বৃত্তের ভিতরে রাখতে হবে।

(খ) যে চাপগুলি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি, তা বৃত্তের বাইরে রাখতে হবে।

করণীয়—অংশগ্রহণকারীকে বলতে হবে বৃত্তের ভিতরের চাপ উদ্রেককারী বিষয় বা ঘটনা কীভাবে বৃত্তের বাইরে আনা সম্ভব হবে।

অনুশীলনের পর—

প্রতিকার—বৌদ্ধিক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি

★ "Source : Prevention of Professional Burn-out with Care Workers : Selfcare and organisational care ; module-13"

১.৩৩ আলোচনা

মূল বক্তব্য

মানসিক চাপের মোকাবিলা করতে হলে, সেই চাপের উৎস বা stressor সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আছে। যদি আমি জানতে পারি কোন্ পরিস্থিতিতে বা কী ধরনের ঘটনায় আমার চাপ সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি সেই ঘটনা বা পরিস্থিতিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি। এই বৃত্তের মধ্যে ও বাইরে যে সব চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনা আপনারা লিখেছেন তার থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট :

১. আপনারা নিজেদের চাপের উৎস সম্বন্ধে সচেতন;

২. কিছু-কিছু চাপ আপনারা নিজেরা মোকাবিলা করতে পারছেন কিন্তু কিছু-কিছু চাপ এমনও আছে, যেগুলি আপনারা মোকাবিলা করতে পারছেন না, সেগুলি বৃত্তের বাইরে রয়েছে।

এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য শুধু আপনাকে নিজের চাপের উৎস-সম্বন্ধে সচেতন করাই নয়, বরং আপনি যে চাপের মোকাবিলা করতে পারছেন না, সেগুলো নিয়ে ভাবানো। আমরা যদি চিন্তা করে নিজেদের বা পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করতে পারি তাহলে হয়তো অনেক চাপের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। যেমন ধরুন, প্রত্যেক দিন বিশেষ একটি রুটে স্কুলে যাওয়ার সময় বাসের প্রচণ্ড ভিড়ে চাপের সৃষ্টি হয়। আমি ভিড় কমাতে পারব না। কিন্তু যদি কোনো বিকল্প রুট থাকে তাহলে আমি হয়তো সে রুটে যাতায়াত করতে পারি। এতদিন

করিনি, কারণ বিকল্প রুটটি দীর্ঘতর এবং সময় বেশি লাগে। কিন্তু চাপ কমাবার জন্য আমাকে হয়তো আমার জীবন-যাত্রার পদ্ধতি কিছুটা পরিবর্তিত করে হয়তো ২০ মিনিট আগে বেরোতে হবে। তাহলে আর ওই প্রচন্ড ভিড়ের চাপ সহ্য করতে হবে না। মনে রাখতে হবে, চাপ কমাবার জন্য হয় বহির্জাগতীয় পরিস্থিতি পরিবর্তিত করতে হবে, অথবা নিজের ধারণা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তিত করতে হবে। এটা করতে পারলে আমরা বেশিরভাগ চাপের মোকাবিলা করতে পারব।

১.৩৪ অনুশীলনী - ১৩

ব্যক্তিগত, কর্মক্ষেত্রে ও সার্বিক পেশাগত জীবনের চাপ নির্ধারণ

উদ্দেশ্য :

(ক) ব্যক্তিগত জীবন।

(খ) কর্মক্ষেত্রে পেশাগত পরিবেশ।

(গ) সার্বিক পেশাগত পরিবেশের চাপ নির্ণায়ণ।

উপকরণ :

১. (ক) (খ) ও (গ) চিহ্নিত **তিনটি** বৃত্ত যুক্ত কাগজ।

২. নিজস্ব লেখার কাগজ।

৩. দুইটি ভিন্ন রঙ-এর পেন/পেনসিল।

ধাপ :

১. যোগদানকারীকে যে-কোনো একটি রঙ-এর পেনসিল দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে চিহ্নিত বৃত্তে যে সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারা গেছে, তা লিখতে হবে।

অন্য রঙ-এর একটি পেনসিল দিয়ে যে সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়নি তা লিখতে হবে। এইভাবে,

আরও **দু'টি** বৃত্তে দুই রঙ-এর পেনসিল দিয়ে লিখতে হবে।

১.৩৫ আলোচনা

মূল বক্তব্য

আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মক্ষেত্র পৃথক হলেও একেবারে পারস্পরিক সংযোগবিহীন নয়। ব্যক্তিগত জীবনের চাপ আমাদের কর্মজীবনকে প্রভাবিত করে এবং বিপরীতটাও সত্য। সুতরাং এই দুটি ক্ষেত্রে চাপের উৎস ও তার প্রতিকার আমাদের সার্বিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করবে।

পূর্বের অনুশীলনীর মতোই এই অনুশীলনীর মাধ্যমেও আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, কর্মগত ও সার্বিকভাবে

পেশাগত জীবনে চাপের উৎস সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। কোন্-কোন্ চাপের আমরা মোকাবিলা করতে পারছি না এবং সেগুলি কীভাবে দূর করা বা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব — আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। সচেতন হবার পর যদি একটু সৃজনমূলকভাবে চিন্তা করা যায়, তাহলে আমরা দেখব, বেশ কিছু চাপ যেগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছিল না, সেগুলিকেও পুরোপুরি দূর করতে না পারলেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

পেশাগত পরিবেশের কিছু পরিস্থিতি হয়তো পরিবর্তিত করা তুলনামূলকভাবে সহজ। সার্বিক পেশাগত পরিবেশের পরিস্থিতি পরিবর্তিত করা তুলনায় কঠিন। যা পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়, তা ভেবে দেখতে হবে, নিয়ন্ত্রণে আনা যায় কিনা এবং তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কীভাবে তার সঙ্গে মানিয়ে চলা যায়, তা ভেবে দেখতে হবে।

১.৩৬ মানসিক স্বাস্থ্য

❒ মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি?

'মানসিক স্বাস্থ্য' বলতে আমরা বুঝি, নিজের সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা, চিন্তা ভাবনার স্বচ্ছতা, আবেগ/অনুভূতি সম্পর্কে সচেতনতা ও তা প্রকাশে সক্ষমতা, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাপনে সক্রিয়তা এবং দৈনন্দিন সাধারণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারার সক্ষমতা।

শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তরণের পথে প্রতিটি শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মেই বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বেশিরভাগ সমস্যাই সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু, একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা বিশেষভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন তখন, যখন দেখেন কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিচ্ছে এবং এর ফলে তার পড়াশোনার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকাকে সমস্যা সমাধানের পথ নিয়েও ভাবতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা মূলত মানুষের চিন্তা (thought), আবেগ/অনুভূতি (emotion/feeling) এবং আচরণ (behaviour)-কে প্রভাবিত করে। শিশুকিশোরদেরও এই তিনটির যে-কোনো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সমস্যার প্রতিফলন দেখা দিতে পারে।

আতঙ্ক, উদ্‌বেগ, অমূলক ভীতি, বারংবার একই কাজের পুনরাবৃত্তি (যেমন—হাত ধোয়া, মুছে লেখা), বিষণ্ণতা, শারীরিক কারণ ছাড়াই শরীরের নানান জায়গায় ব্যথা-বেদনা, অতিদুরন্তপনা, মনোযোগের অভাব—পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া, আচরণজনিত নানান সমস্যা—এই সব উপসর্গের (symptoms) মূলে রয়েছে মানসিক অসুস্থতা।

❒ কোন্‌টি মানসিক সমস্যা, কোন্‌টি নয় — কীভাবে বুঝবো আমরা?

কোনো শিশু বা কিশোরের চিন্তা, আবেগ এবং আচরণজনিত কোনো অস্বাভাবিকতাকে মানসিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করার আগে আমরা নীচের এই চারটি বিষয়ে নিশ্চিত হব—

১. শিশু বা কিশোরটি কোনো নেতিবাচক চিন্তা বা অনুভূতি (negative thinking or feeling)-র কারণে যদি মনের মধ্যে কষ্ট পেতে থাকে।

২. শিশু বা কিশোরটি কোনো আচরণ (behaviour)-এর দ্বারা নিজের অথবা অপরের ক্ষতি করে এবং এই আচরণের বারংবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে ক্ষতিকর পরিণতি (negative consequence)-র কথা জানা সত্ত্বেও।

৩. শিশু বা কিশোরটির পড়াশোনা, খেলাধুলা কিংবা অন্যান্য দৈনন্দিন কাজকর্মও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে থাকে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপরেও।

৪. সমস্যার পুনরাবৃত্তি, ধারাবাহিকতা এবং গভীরতাও অসুস্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। আমাদের লক্ষ রাখতে হবে সমস্যাটি বেশ কিছুদিন ধরেই স্থায়ী হচ্ছে কিনা।

❐ ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষকশিক্ষিকাদের ভূমিকা

ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় শিক্ষকশিক্ষিকারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রী সারাদিনের অনেকটা সময় স্কুলে থাকে। শিক্ষকশিক্ষিকাদের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ ধরে ছাত্রছাত্রীদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। তাদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ, খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ, আচার-আচরণ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, অন্যান্য সৃজনশীলতা — এই সবকিছুর উপরেই শিক্ষকশিক্ষিকারা নজর রাখতে পারেন। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু সচেতনতা এবং এই সংক্রান্ত সামান্য কিছু প্রশিক্ষণ থাকলেই শিক্ষকশিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, প্রাথমিকস্তরে প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং (Counselling) এবং সমস্যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো—এই কাজগুলি সার্থকভাবেই করতে পারবেন।

ক. *সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of problem)* :

কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর পড়াশোনায় হঠাৎ কিংবা ক্রমশ অবনতি, আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা, আবেগজনিত সমস্যা অথবা ব্যক্তিগত পরিচর্যায় উদাসীনতা শিক্ষকশিক্ষিকাদের চোখেই সবার আগে ধরা পড়ে। এই ধরনের এক বা একাধিক উপসর্গ দেখে তাঁরা চিহ্নিত করতে পারেন কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মানসিক স্বাস্থ্যের কোনো বিশেষ সমস্যাকে।

খ. *প্রাথমিকস্তরে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান (Counselling)* :

সাধারণভাবে শিক্ষকশিক্ষিকারা জেনে বা না-জেনে ছাত্রছাত্রীদের নানান সমস্যায় কাউন্সেলিং করেই থাকেন। ছাত্রছাত্রীরাও তাদের প্রয়োজনে অনেক সময়েই বিশেষ কোনো শিক্ষকশিক্ষিকার পরামর্শ নিয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের কথা মন দিয়ে শোনা এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া—এই কাজ কিছু কিছু শিক্ষকশিক্ষিকা বেশ ভালোভাবেই করতে পারেন। তবে অনেকক্ষেত্রে বিপত্তিও ঘটে। কাউন্সেলিং (Counselling)-এর নিজস্ব কর্মপদ্ধতি (methodology) রয়েছে, কিছু বিশেষ skill-এর প্রয়োজন হয়—যা সামান্য প্রশিক্ষণের সাহায্যে যে-কোনো শিক্ষকশিক্ষিকা-ই আয়ত্ত করতে পারেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই (কোনো বিশেষজ্ঞের হস্তক্ষেপ ছাড়াই) কাউন্সেলিং-এর সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের নানাবিধ সমস্যায় সহায়তা করতে পারেন।

গ. *সমস্যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের কাছে প্রেরণ (Referral)* :

বেশ কিছু সমস্যা—যেগুলির সমাধানে মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (Psychiatrist), মনোবিজ্ঞানী

(Psychologist), কাউন্সেলর (Counsellor) কিংবা বিশেষ প্রশিক্ষক (Special educator)-এর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কোন্ সমস্যায়, কখন, কার কাছে পাঠানো যায়—তা একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা (মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা সম্পর্কে যদি তাঁর বিজ্ঞানসম্মত ধারণা থাকে) সহজেই নির্ধারণ করতে পারেন। সাহায্য করতে পারেন বড়ো ধরনের কোনো মানসিক সমস্যা ঠিক সময়ে চিহ্নিতকরণে এবং অনেকক্ষেত্রে প্রতিরোধে।

নির্দিষ্টভাবে এই তিনটি ক্ষেত্রে সাহায্য করা ছাড়াও শিক্ষকশিক্ষিকারা প্রয়োজনে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যায় parents counselling-এও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

সাধারণত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে
মানসিক সমস্যাগুলি দেখা যায়

আবেগজনিত সমস্যা
(Emotional Disorders

A. Anxiety-related disorders
(উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা-সংক্রান্ত সমস্যা)

- Generalised Anxiety Disorder
- Examination anxiety
- Panic attack
- Obsessive–compulsive disorder
- Phobia
  - — Specific phobia
  - — Social phobia
  - — Agora phobia

B. Somatoform Disorders
(মানসিক সমস্যাজনিত শারীরিক উপসর্গ)

Somatization disorder
Conversion disorder

C. Depressive Disorder
(বিষণ্ণতা অসুখ)

আচরণের সমস্যা
(Behavioural Disorders)

A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(অতি দুরন্তপনা ও মনোযোগের সমস্যা)

B. Conduct Disorder)
(অসামাজিক আচরণের সমস্যা)

C. Oppositional Defiant Disorder
(অবাধ্য আচরণের সমস্যা)

★ ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। সচরাচর যে সমস্যাগুলি দেখা যায় এবং শিক্ষকশিক্ষিকা অনেক সময় 'ইচ্ছাকৃত' আচরণ বা সমস্যা হিসাবে অনেক সময় দেখে থাকেন অথচ এগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা কষ্ট পায়, তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে সেই সমস্যাগুলিই এখানে উল্লেখ করা হল। বাদ থেকে গেল অনেক কিছুই। আশা করা যায়, শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছে সমস্যাগুলি বোঝার ক্ষেত্রে এই আলোচনা সহায়তা করবে কিছুটা।

(ক) আবেগজনিত সমস্যা (EMOTIONAL DISORDER)

এই ধরনের সমস্যাগুলিকে এখানে আমরা মূল তিন ভাগে ভাগ করব—

A. Anxiety-related disorders (উদ্‌বেগ-সংক্রান্ত সমস্যা)

B. Somatoform disorders (মানসিক সমস্যাজনিত শারীরিক উপসর্গ)

C. Depressive disorder and suicide (বিষণ্ণতা অসুখ ও আত্মহত্যা)

A. Anxiety-related disorders (উদ্‌বেগ-সংক্রান্ত সমস্যা)

উদ্‌বেগ বা উৎকণ্ঠা-সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভয় বা আতঙ্কের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ দেখা যায়।

"বছর বারো বয়সের সৌতিক মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বাবা প্রবাসে কর্মরত, মা বাড়ি থেকে মিনিট পনেরোয় পায়ে হেঁটে যাওয়া — এমন দূরত্বের একটি নার্সিংহোমে রিসেপশনিস্ট হিসাবে কাজ করেন। বেশিরভাগ সময় দাদু ও দিদার তত্ত্বাবধানে থাকতে হয় সৌতিককে।

সৌতিকের সমস্যা হল, সে সবকিছুতেই অত্যধিক উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং ধরেই নেয় কোনো একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মায়ের দশ মিনিট ফিরতে দেরি হলে বাড়িতে তাকে ধরে রাখতে পারেন না দাদু ও দিদা। ছুটে চলে যায় সোজা নার্সিংহোমে। বাবার ফোন আসতে দেরি হলে ঘরময় অস্থির পায়চারি শুরু হয়ে যায় তার। কোনো অনুষ্ঠানে বা স্কুলে যাবার সময়ও অত্যধিক উদ্‌বেগ ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে। সে ধরে নেয় খুব দেরি হয়ে যাবে পৌঁছোতে। যদিও তার এই উদ্‌বেগ-আশঙ্কার বাস্তবভিত্তি কিছুমাত্র নেই। সবটাই অস্বাভাবিক এবং অযৌক্তিক।

সৌতিকের দাদুকে স্কুলে ডেকে পাঠিয়ে, কথা বলে এইসব তথ্য জানতে পারলেন তার ক্লাস টিচার সোমনাথবাবু। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি লক্ষ করছিলেন, সৌতিককে কোনো কারণে ক্লাসের মধ্যে ডাকলেই ও চমকে ওঠে। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা ভয়ের ভাব, যা অন্য কোনো ছেলের মধ্যে তিনি খুব একটা দেখেননি। ক্লাসে পড়া ধরলে বা রিডিং পড়তে বললে ওর কথা আটকে যায় প্রথমদিকে। কিছুটা পড়ার পর অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে ওর এই অস্বাভাবিক উদ্‌বেগ নিয়ে সোমনাথবাবু খানিক চিন্তিতই। তাঁর মনে হয়েছে ছেলেটি এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে পড়াশোনাটাও একটু ভালোমতো করতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যেই সৌতিকের দাদুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি।"

সৌতিকের সমস্যা আসলে উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার সমস্যা। মনোরোগ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সমস্যাটি Generalised anxiety disorder (জেনারালাইস্‌ড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার) নামে পরিচিত।

❑ উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার সরাসরি প্রকাশ ঘটে নীচের লক্ষণগুলির মধ্য দিয়ে—

❖ উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার শারীরিক লক্ষণ :

হাত-পা কাঁপা, ঝাঁকুনি, আচমকা পেশিতে টান ধরা, পেশিগুলি শক্ত বা টানটান হয়ে আসা, মাথা ব্যথা, পিঠে যন্ত্রণা, শ্বাস নিতে কষ্ট, শ্বাসপ্রশ্বাসের লয় দ্রুত হওয়া, অল্পতেই ক্লান্তিবোধ, তোতলামির লক্ষণ ফুটে ওঠা, কথা আটকে যাওয়া, গলায় কিছু আটকে থাকার অনুভূতি, মুখের রঙ ফ্যাকাসে বা লাল হয়ে ওঠা, কান গরম হয়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, হাত ও পায়ের পাতা ঘেমে যাওয়া, হাত ও পা ঠান্ডা হয়ে আসা, ডায়ারিয়া বা পেটের মধ্যে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব/গা গোলানো, বমি পাওয়া, মুখ শুকিয়ে আসা, ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া প্রভৃতি।

❖ উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার মানসিক লক্ষণ :

ভয় ও আতঙ্কের অনুভূতি, কোনো কিছুতে মনোযোগ না দিতে পারা, অস্থিরতা, বিরক্তি, অস্বস্তিকর অনুভূতি, অতিরিক্ত সতর্কতা, হঠাৎ ডাকলে চম্‌কে ওঠা, ঘুম না হওয়া, নিরাপত্তাবোধের অভাব, আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা, নিজেকে অসহায় ভাবা, বিপদগ্রস্ত মনে করা, ঘুম আসতে দেরি হওয়া প্রভৃতি।

অনেক সময়ে অতিচঞ্চলতা, বিরক্তি-রাগ-জেদ, আক্রমণাত্মক আচরণ, তোতলামি, বড়ো বয়সেও রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলা, ঘন ঘন পায়খানার বেগ, কারও সঙ্গে মেলামেশা না করা, লেখা বা পড়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা, নখ কাটা, আঙুল চোষা, পেনসিল-চক-চুন-ছাই-মাটি প্রভৃতি অখাদ্য খাওয়ার অভ্যেস—এই সব সমস্যাগুলির মধ্যেই একটু গভীরে গিয়ে বা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে উদ্‌বেগ বা উৎকণ্ঠার ভূমিকা সুপ্তভাবে রয়েছে।

★ Examination anxiety

উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার প্রকাশ ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের মধ্যে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রায় বার বার ফিরে আসে — সেই পরিস্থিতিটি হল পরীক্ষা-র আগে কিংবা পরীক্ষার সময়ে। এখানে সংক্ষেপে তা আলোচিত হল।

পরীক্ষা এগিয়ে এলেই বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে দেখা যায় উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার কারণে তারা নানান ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এর ফলে মানসিক এবং শারীরিক বেশ কিছু সমস্যার লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যায়। পরীক্ষা নিয়ে অস্বাভাবিক উদ্‌বেগ অর্থাৎ পরীক্ষায় ভালো ফল না করতে পারার আশঙ্কা তো থাকেই, তার সঙ্গে থাকে অস্থিরতা, একটুতেই বিরক্তি কিংবা রাগ, পড়াশোনায় মনঃসংযোগে অক্ষমতা, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস প্রশ্বাসের লয় দ্রুত হয়ে যাওয়া, হাত ও পা কাঁপা, হাত ও পায়ের পাতা ঘামতে থাকা, বমি হওয়া কিংবা বমি বমি ভাব, ঘুম স্বাভাবিক না থাকা, প্রভৃতি নানান মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে — এমন একটা আশঙ্কা তাদের মনের মধ্যে ক্রমশ গেঁথে যায়।

এই সময় শারীরিক বেশ কিছু সমস্যাও তাদের মধ্যে দেখা যায়। উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণেই সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে তেমন খেয়াল থাকে না এই সময়। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও প্রবল উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠার কারণে কিছুটা কমে যায়। এইসব কারণে প্রায় নিয়মিতই জ্বর, পেট খারাপ, মাথা ব্যথা প্রভৃতি হাতে থাকে। এর ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সমস্যা দেখা দেয়, ফলে পরীক্ষা নিয়ে উদ্‌বেগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসে পরীক্ষা নিয়ে উদ্‌বেগও ততই বাড়তে থাকে। শেষ অবধি দেখা যায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষাই দিতে পারল না অস্বাভাবিক উদ্‌বেগের কারণে।

Panic attack হল উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার চরম প্রকাশ। উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার অনেকগুলি শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ এই Panic attack-এর সময় একসঙ্গে প্রবলভাবে ফুটে ওঠে।

অনেকসময়ই দেখা যায় কোনো বিশেষ পরিবেশে হঠাৎ-ই panic attack হওয়ার পর সেই পরিবেশকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা তৈরি হয়।

Obsession (অবসেশন্) হল একরকম চিন্তা—যা আক্রান্ত ছেলে বা মেয়েটির মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারে বারে আসে। সে জানে, এ চিন্তার কোনো মানে হয় না, এ চিন্তা অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক। মন থেকে তাড়াতেই চায় সেই চিন্তা। কিন্তু, পারে না কিছুতেই। এর ফলে তাকে একটা বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়—মন দিতে পারে না কোনো জরুরি কাজেও।

Compulsion (কমপালশন্) হল অবসেশন্-এরই প্রতিফলনযুক্ত আচরণ। একটা কাজ যা আক্রান্ত ছাত্র বা ছাত্রীটিকে বারে বারে বাধ্যতামূলকভাবে করে যেতে হয় (যেমন বার বার ধোয়া, মোছা, গোনা বা ছোঁয়া), অথচ সে একাজ করতে চায় না। এই নিয়ে যথেষ্ট কষ্টও পায় নিজের মনে। সবসময় মনের মধ্যে একটা ভয় হয় যে, এসব কাজ না করতে পারলে তার নিজের কোনো ক্ষতি হবে অথবা তার কোনো প্রিয়জনের বিপদআপদ হবে। প্রয়োজনীয় কাজগুলিও শেষ করতে পারে না। এর ফলে, দেরি হয়ে যায় বার বার করতে গিয়ে—তবু অযৌক্তিক কাজগুলি থেকে সরেও আসতে পারে না।

একটা উদাহরণ দিলে অবসেশন্ এবং কমপালশন্-এর মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে একটু সুবিধা হবে—

একজনকে দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধুয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে সাধারণত কেউ হাত ধোয় না।

এক্ষেত্রে চিন্তা (অবসেশন্) → হাত নোংরা হয়ে আছে।

চিন্তার ব্যাবহারিক প্রতিফলন (কমপালশন্) → হাত ধুয়ে ফেলা।

এখানে যে কটি বিষয় আলোচিত হল তার বাইরেও বেশ কিছু উদ্‌বেগ-সংক্রান্ত সমস্যা আমরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখতে পাই। এখানে সেগুলির মধ্যে থেকে দুটি সমস্যাকে বেছে নেওয়া হচ্ছে।

উদ্‌বেগ-সংক্রান্ত আরও তিনটি সমস্যা আমরা নীচে আলোচনা করছি :

(a) Specific phobia (b) Social phobia এবং (c) Agora phobia।

(a) **Specific phobia** — নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ জীবজন্তু, কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থান (উচ্চতা, সুড়ঙ্গ প্রভৃতি), প্রাকৃতিক ঘটনা (ঝড়, বজ্রপাত প্রভৃতি), বিশেষ কোনো স্থান বা পরিস্থিতি (বদ্ধ জায়গা, লিফ্‌ট, অন্ধকার, অত্যাধিক শব্দময় আলোকিত স্থান প্রভৃতি), রক্তপাত, ইঞ্জেকশন এবং কোনো বিশেষ রোগ (এইডস, টিউবারকিউলোসিস, ক্যানসার প্রভৃতি) এইগুলির মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক ভীতি এবং সেই ভীতির কারণে নির্দিষ্ট উদ্দীপকটিকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা। এক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট উদ্দীপকের কাছাকাছি হলেই ছাত্র বা ছাত্রীর মনে প্রচণ্ড উদ্‌বেগের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষেত্রে প্রায় panic attack-এ আক্রান্ত হওয়ার মতো অবস্থা হয়।

(b) **Social phobia** — এই সমস্যা বেশিরভাগ সময় কৈশোরের শুরুতে দেখা যায়। তবে আরও কমবয়সীদের মধ্যেও এই সমস্যা চোখে পড়ে। Social phobia-তে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত সামাজিক মেলামেশা (বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে), অনুষ্ঠান, সম্মিলনী প্রভৃতির মুখোমুখি হতে ভয় পায়, এড়িয়ে চলতে চায় এগুলিকে। এটি মূলত low self esteem বা হীনম্মন্যতাজনিত একটি সমস্যা। নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থার অভাব থাকায় এবং সমালোচিত হওয়ার অমূলক আশঙ্কা থেকেই Social phobia-র সূত্রপাত। Phobic situation-এর মুখোমুখি হওয়ার ভীতি থেকে যে উদ্‌বেগ সৃষ্টি হয় মনে — তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নানান শারীরিক উপসর্গের মাধ্যমে।

(c) **Agora phobia** — কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে যানবাহন / স্থানে তীব্র উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার শিকার হয়, দেখা দেয়তাদের মনে চূড়ান্ত নিরাপত্তাবোধের অভাব, যেন দমবন্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাদের মনে — ওই অবস্থান থেকে নিরাপদ স্থানে সরে আসার পথও যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার লক্ষগুলি ফুটে ওঠে শরীর ও মনে (যেমন — ভয়, বুক ধড়ফড়, গলা শুকিয়ে আসা, ঘামতে থাকা, চূড়ান্ত অস্থিরতা প্রভৃতি)।

Social phobia বাড়ির বাইরে অন্যদের সঙ্গে সহজে না মিশতে পারার অন্যতম কারণ হতে পারে অনেকক্ষেত্রে।

❒ শিক্ষকশিক্ষিকারা এক্ষেত্রে কী করবেন—

১. কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে উদ্‌বেগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠলে একান্তে আলো-বাতাসযুক্ত, আরামদায়ক (comfortable) একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে empathy বা সমানুভূতি বা সহমর্মিতার সঙ্গে তার মনের অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করা, তাকে ভরসা দেওয়া (নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া), তার মনে সাহস জোগানো খুব জরুরি। তার উদ্‌বেগকে উড়িয়ে দেওয়া নয়, যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

'তোমার মনে এখন কী হচ্ছে? কী কষ্ট হচ্ছে? — তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো আমাকে, আমি তোমাকে সাহায্য করবো' — এইভাবে বলা কথায় ছাত্র বা ছাত্রীটির মনে নিরাপত্তাবোধ কিছুটা আশা করা যায় ফিরে আসবে এবং সে কিছুটা সহজও হতে পারবে।

২. Generalised Anxiety Disorder - এ আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীর মনে যে ভয় বা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয় তা প্রায় সবক্ষেত্রেই অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এমন খুব ছোটো একটি বিষয়কেও খুব বড়ো করে দেখার প্রবণতা এই অসুখে চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রথমে বুঝে নিতে হবে উদ্‌বেগের মাত্রা কতটা গভীর। যদি উদ্‌বেগ খুব গভীর এবং তার প্রকাশ খুব প্রবল হয় তাহলে তার বাড়িতে খবর দিয়ে কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিন।

আর উদ্‌বেগ যদি ততটা প্রবল না হয়, তাহলে ছাত্র বা ছাত্রীটির সঙ্গে কথা বলে তার দুশ্চিন্তা বা ভয়ের কারণটিকে প্রথমে চিনে নেওয়া দরকার। এরপর তার মনের অযৌক্তিক চিন্তাকে কিছু বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে দূর করে কারণটি সম্পর্কে অযথা দুশ্চিন্তাই যে তার মনে তৈরি হচ্ছে — তা তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩. কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর panic attack হলে দেরি না করে সরাসরি তাকে কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তবে তার আগে অবশ্যই সেই ছাত্র বা ছাত্রীর বাড়িতে খবর দেওয়া প্রয়োজন।

৪. **উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার সমস্যায় আক্রান্ত ছাত্র বা ছাত্রীর কষ্ট (distress) একটু মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। অন্য ছাত্র বা ছাত্রী কিংবা কোনো শিক্ষকশিক্ষিকা আক্রান্ত ছাত্র বা ছাত্রীর সমস্যা নিয়ে যেন ব্যঙ্গ না করেন এবং অমানবিক আচরণ না করেন — সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।**

৫. ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবক-অভিভাবিকার সঙ্গে কথা বলুন। সমস্যাটির গুরুত্ব তাঁদের স্পষ্ট করে বোঝান। বাড়ির পরিবেশের মধ্যেই যদি উদ্‌বেগের বীজ লুকিয়ে থাকে তবে তা খুঁজে বের করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিন।

৬. উদ্‌বেগ যদি প্রবল হয়,তার গভীরতা যদি বেশি হয়, ঘন ঘন যদি তার প্রকাশ দেখা যায় কিংবা দীর্ঘদিন ধরে যদি চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিন ছাত্র বা ছাত্রীটির অভিভাবককে।

৭. Simple relaxation (শবাসনে কিছুক্ষণ শান্তভাবে শুয়ে থাকলেও হবে) দুশ্চিন্তা কমিয়ে আনতে খুব সাহায্য করে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত তা অভ্যাসের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। যে-কোনো মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হলেও নিয়মিত relaxation অভ্যাস করা জরুরি।

৮. Examination Anxiety — এক্ষেত্রে শিক্ষকশিক্ষিকাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে পরিকল্পনামাফিক প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী চলার পরামর্শ আপনারা দিতে পারেন ছাত্রছাত্রীদের। উদ্‌বেগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনমতো চিকিৎসক কিংবা মনোবিদের কাছে পাঠাতে পারেন। সেই ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে কথা বলে উদ্‌বেগের কারণটিকে শনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

আমরা এখানে পরীক্ষাভীতিতে যাতে ছাত্রছাত্রীরা আক্রান্ত না হয় তার জন্য কীভাবে পরীক্ষার ঠিক আগের দিনগুলিতে প্রস্তুতি নিতে হবে — সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। **সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করেই একেবারে মুখোমুখি বসে বলার ভঙ্গিতে বিষয়টি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।** আমরা আশা করব শিক্ষকশিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের কাছে হুবহু তা পৌঁছে দেবেন যাতে তারা উদ্‌বেগমুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে পারে।

B. Somatoform disorders (মানসিক সমস্যাজনিত শারীরিক উপসর্গ)

এই অসুখে আক্রান্ত শিশু-কিশোরের মধ্যে সাধারণত এক বা একাধিক শারীরিক উপসর্গ দেখা যায়। কিন্তু, শারীরিক সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও কোনো যথার্থ কারণ সেই উপসর্গের সপক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না।

Somatoform disorder-এর বেশ কয়েকটি ভাগ থাকলেও আমরা এখানে মাত্র **দুটি** নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ, বিদ্যালয়স্তরে সচরাচর এই দুটি সমস্যাই চোখে পড়ে বেশি।

B_1. Somatization disorder

B_2. Conversion disorder

B_1. Somatization disorder

এই অসুখে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা নানান শারীরিক সমস্যার কথা বলে। কিন্তু কখনও তা একটি মাত্র অঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকে না। বলাবাহুল্য, এইসব শারীরিক সমস্যার যথার্থ কোনো শারীরিক ভিত্তি থাকে না।

"অনির্বান প্রায়ই টিফিনের সময় বাড়ি যেতে চায়। কখনও মাথা ব্যথা বা কখনও পিঠে ব্যথা। আবার কখনও কখনও পেট চেপে বসে পড়ে। বেশ কয়েকবার ডাক্তার ডেকে পরীক্ষা করালেও কিছু ধরা পড়ল না।"

সমস্যাটি চেনার উপায়

১. Somatization disorder-এ আক্রান্ত ছাত্র বা ছাত্রী প্রায়শই নানান শারীরিক সমস্যার কথা বলবে। যেমন — মাথা যন্ত্রণা, পেট ব্যথা, পিঠের যন্ত্রণা, হাড়ের নানান সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব, বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি এবং এক এক দিন এক এক রকম সমস্যার কথা বলবে।

২. নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও উপরোক্ত সমস্যাগুলির কোনো শারীরিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রচুর ওষুধপত্র খেয়েও কোনো লাভ হয় না।

সমস্যাটির সম্ভাব্য কারণ

১. অন্যের প্রতি হওয়া কোনো রাগ, ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ না করে অবদমন করা এবং তা নিজের প্রতিই চালিত করা, নিজের যোগ্যতাকে ছোটো করে দেখা বা হীনম্মন্যতা (low self esteem) প্রভৃতি Somatization disorder সৃষ্টি হওয়ার মূলে থাকতে পারে।

২. অনেক সময় বাবা কিংবা মায়ের অথবা অন্যকোনো ঘনিষ্ঠ জনের শারীরিক সমস্যাকে নিজেরও সমস্যা হিসাবে দেখতে শুরু করে। অর্থাৎ এখানে দেখে শেখার বিষয়টিও কাজ করে মনে।

শিক্ষকশিক্ষিকা কী করতে পারেন এই সমস্যায়

১. ছাত্র বা ছাত্রীটির শারীরিক উপসর্গগুলির কোনো যথার্থ শারীরিক ভিত্তি নেই — এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ছাত্র বা ছাত্রীটির সঙ্গে একান্তে, একটু আরামদায়ক (comfortable) পরিবেশে কথা বলে তার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করা এবং তার সমস্যার মূলে যে-কোনো মনের কষ্ট (অবদমিত রাগ, ক্ষোভ কিংবা অভিমান) থাকতে পারে, সে বিষয়ে ধীরে ধীরে তাকে সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করা প্রয়োজন (insight building)।

২. ছাত্র বা ছাত্রীটির জীবনে কোনো কষ্ট (distress) যদি থেকে থাকে, তবে সেই কষ্টের কারণটি প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার এবং সেই মতো তার counselling-এর প্রয়োজন। প্রয়োজন পৃথকভাবে তার অভিভাবক-অভিভাবিকার সঙ্গেও কথা বলা।

৩. ছাত্র বা ছাত্রীটির অভিভাবককে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন কোনো মনোরোগ চিকিৎসক (psychiatrist) এর কাছে ছাত্র বা ছাত্রীটিকে নিয়ে যাবার জন্য। কারণ, এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে কিছু ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

B_2. Conversion disorder

এই অসুখে কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব অথবা মানসিক প্রত্যাশা converted (পরিবর্তিত) হয়ে শারীরিক কিছু উপসর্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অতীতে এই অসুখটি hysteria নামে পরিচিত ছিল।

"ঋতুপর্ণা পড়াশোনায় ভালো। ভালো গান করে সে। বার্ষিক পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে সকলের সামনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার পরেই হাত-পায়ে খিচুনি হতে শুরু হল। সবাই ওকে ধরে বিছানায় শুইয়ে জল দিল চোখেমুখে। ডাক্তার এলেন রক্তচাপ দেখলেন কিন্তু কিছুই সেরকম খুঁজেই পেলেন না।"

সমস্যাটি চেনার উপায়

১. শারীরভিত্তিক কারণ ছাড়াই শরীরের কোনো অংশে হঠাৎ অসাড় বোধ (paralysis) হওয়া, 'অজ্ঞান' হয়ে যাওয়া, হঠাৎই চোখে দেখতে না পাওয়া কিংবা কানে শুনতে না পাওয়া ইত্যাদি নানা মানসিক দ্বন্দ্ব এবং অবদমিত চাহিদার শরীরকেন্দ্রিক বহিঃপ্রকাশ যদি কোনো ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ঘনঘনই দেখা যায়।

২. মৃগী (Epilepsy) রোগের ফিটের মতো হলেও চরিত্রগতভাবে Conversion disorder-এর ফিট সম্পূর্ণ আলাদা। Conversion disorder-এ ফিটের সময় রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় না, ফিটের সময় যখন মাটিতে পড়ে তখন সাধারণত কোথাও চোট লাগা বা কেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটে না এই কারণেই। ফিট অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, খিচুঁনি (convulsion) হলেও মৃগীর মতো rhythmic convulsion নয়। শুধু কোনো চিকিৎসকই

সঠিকভাবে conversion disorder-এর diagnosis করতে গেলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় Epilepsy (মৃগী)-ও রয়েছে conversion disorder-এর পাশাপাশি। তবুও কিছু সাধারণ লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হল।

৩. Conversion disorder-এ primary gain এবং secondary gain থাকবে। Primary gain হল, মনের মধ্যে অবদমিত যে দ্বন্দ্ব বা প্রত্যাশা রয়েছে, তা নিরসন কিংবা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা। Secondary gain হল, attack-এর সময় সাময়িকভাবে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া এবং নিজের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই কারণেই conversion fit কখনও নির্জনে বা ঘুমের মধ্যে হয় না। ঘরের মধ্যে কিংবা আশপাশে কেউ না কেউ থাকেই ফিটের সময়।

৪. Conversion disorder-এ আক্রান্ত ছাত্র বা ছাত্রীর মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট (distress) থাকে এবং এই ফিটের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

এই সমস্যার সম্ভাব্য কারণ

১. যখন কোনো ছাত্র বা ছাত্রী মনের বিশেষ কোনো দ্বন্দ্ব বা আকাঙ্ক্ষা সরাসরি প্রকাশ করতে পারছে না, তখন তা অবদমিত হচ্ছে মনের অবচেতনে — সেই অবদমনেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানান শারীরিক উপসর্গের মধ্য দিয়ে।

২. স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে, Conversion disorder-এর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কিছু বেহিসাবি কার্যকলাপও দায়ি থাকতে পারে।

শিক্ষকশিক্ষিকারা এই সমস্যায় আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে সাহায্য করতে পারেন

১. Conversion disorder-এর জন্যই ফিট (fit) হচ্ছে — এ বিষয়ে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে প্রথমেই ফিট হওয়া ছাত্র বা ছাত্রীটিকে **দু-তিন** জন মিলে ধরে ক্লাসরুম থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্কুলেরই কোনো নির্জন কোলাহলমুক্ত ঘরে শুইয়ে দিতে হবে।

২. সুস্থ হয়ে বসার পর সেই ছাত্র/ছাত্রীটির সঙ্গে একান্ত কথা বলে তার অসুবিধার কথা সমানুভূতির (empathy) সঙ্গে জানা এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজনমতো সেই অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে তাকে সাহায্য করা যেতে পারে।

৩. সেই ছাত্র/ছাত্রীটির অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে তার সমস্যা সম্পর্কে জানতে এবং জানাতে হবে ও প্রয়োজনে মনোরোগ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিতে হবে।

৪. অসুস্থ ছাত্র/ছাত্রীটির ফিট হওয়া বা হাত-পা অসাড় হয়ে যাওয়া কিংবা চোখে দেখতে না পাওয়া ইত্যাদি — এই সব কিছুই তার অসুস্থতাজনিত উপসর্গই, ইচ্ছাকৃত নয়। সে যথেষ্ট মনোকষ্টেই থাকে। সুতরাং, তার অসুস্থতা নিয়ে কেউ যেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না করে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষকশিক্ষিকাদেরই।

C. Depressive disorder (বিষণ্ণতা অসুখ)

"শ্রমণা ক্লাস সেভেনে পড়ে। কিছুদিন হল ও খুব চুপচাপ থাকে, খুব সামান্য কারণেই ওর দুচোখ জলে ভরে আসে। কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে চায় না। একটুতেই বিরক্ত বোধ করে। সামনেই পরীক্ষা। কিন্তু ওর মনে কোনো আগ্রহ নেই পড়াশোনা নিয়ে। শুধু পড়াশোনাতেই বা কেন — খেলাধূলা, গান করা, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা — এসব কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ নেই।"

প্রায় মাস তিনেক ধরে এই অবস্থা চলছে। সাধারণত উচ্ছল মেয়েটির এই পরিবর্তন স্কুলের দুএকজন শিক্ষিকার নজরে পড়ে। তাঁদেরই একজন শ্রমণার মাকে ডেকে পাঠিয়ে একজন মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে তাকে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। চিকিৎসক তার এবং তার বাবা-মার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর জানান, 'শ্রমণা বিষণ্ণতা রোগ বা Depressive disorder-এ আক্রান্ত।

মন খারাপ আমাদের সকলেরই হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তা সাময়িক। তার তীব্রতা বা গভীরতাও কম থাকে। আমাদের রোজকারের কাজকর্মে, সামাজিক মেলামেশায় তার খুব একটা প্রভাব পড়ে না। নিজের থেকেই আবার তা চলেও যায়।

কিন্তু, কারও কারও ক্ষেত্রে কখনও এই মন খারাপই এক তীব্র এবং গভীর রূপ নেয়। মনের মধ্যে বিষণ্ণতাবোধ খুব তীব্র হয়ে ওঠে। কিছুই ভালো লাগে না, কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। একটুতেই দু'চোখ জলে ভরে আসে। অসুখী আর হতাশার ছাপ কিংবা দুচোখের দৃষ্টিতে উদাসীনতা — একটু মন দিয়ে লক্ষ করলেই চোখে পড়ে। ভালো লাগে না পড়াশোনা, খেলাধুলা, গান শোনা, সিনেমা দেখা কোনো কিছুই। বিপত্তিকর কোনো কিছুর জন্যই নিজেকেই দায়ি বলে মনে হয় (অনেক সময় অযৌক্তিকভাবেই)। নিজেকে অপদার্থ বলে মনে হয়। ভালো কথা বললেও যেন গায়ে লাগে— অতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে মন। দেখা যায়, একটুতেই বিরক্তি আর রাগ।

চিন্তা ভাবনা, কথাবার্তা আর কাজকর্মের গতি অনেকটাই শ্লথ (slow) হয়ে যায়। সাধারণত চুপচাপ আর একা থাকতে চায় মন। অন্যদের এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে করে, খুব অল্পেই হতাশা আসে মনে। মন চায় দূরে কোথাও চলে যেতে। এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও মনের মধ্যে চলে আসে।

মন খারাপের এই তীব্র এবং গভীর রূপ যদি কারও মনে দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকে তখন আমরা এই মন খারাপকে বিষণ্ণতা অসুখ বা Depressive disorder হিসাবে দেখব। বিষণ্ণতা শুধু মন নয়, প্রভাব ফেলে ঘুম, খাওয়া প্রভৃতির উপরেও। বিষণ্ণতায় আক্রান্ত মানুষের ঘুম এবং খিদে স্বাভাবিক থাকে না, হয় তা কমে যায় কিংবা বেড়ে যায়। খিদে কমা ও বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওজনেরও তারতম্য ঘটে।

এই বিষণ্ণতা শুধু যে বড়োদেরই হয় তা নয়, শৈশব এবং কৈশোরেও বিষণ্ণতা দেখা যায়। তবে তার প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য অবশ্য থাকে। বড়োরা নিজেদের বিষণ্ণ মনের কথা অনেকসময় বলতে পারেন। কিন্তু, শিশু বা কিশোররা সাধারণত বলে না যে 'আমি বিষণ্ণ' বা 'আমি ডিপ্রেস্'। এমনকি 'আমার মন ভালো নেই' বা 'আমার মন খারাপ' — এ ধরনের কথাও কম বয়সের ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে খুব কমই শোনা যায়।

আত্মহত্যার যাবতীয় কারণের মধ্যে বিষণ্ণতাই অন্যতম প্রধান কারণ। বিষণ্ণতাকে প্রথমদিকেই যদি চিহ্নিত করা যায় ও তার চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে আত্মহননের সংখ্যা যে কমে আসবেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিষণ্ণতার সম্ভাব্য কারণগুলি

১. পরিবেশগত কারণ

পড়াশোনার অত্যধিক এবং দীর্ঘস্থায়ী চাপ

পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল কিংবা খারাপ ফলের আশঙ্কা

নিকটজনের থেকে বিচ্ছিন্নতা

বাড়িতে/স্কুলে/বন্ধুদের মধ্যে কারও আচরণে কষ্ট পাওয়া

কোনোকিছু হারিয়ে ফেলা

কোনো কারণে শাস্তি পাওয়া

দীর্ঘকালীন কোনো শরীরিক অসুস্থতা

পরিবারে অশান্তি

আর্থিক অনটন

স্কুলের পরিবেশে মানিয়ে নিতে না পারা — প্রভৃতি।

২. জৈবরাসায়নিক কারণ

পরিবেশগত উপরের প্রতিকূল অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দিয়ে অনেকেই যায়। কিন্তু, তারা সকলেই বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয় না। আক্রান্ত হয় তারাই, যাদের আগে থেকেই জৈবরাসায়নিক ভারসাম্যের সমস্যা রয়েছে।

Depressive disorder-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, Norepinephrine (Noradrenaline) আর Serotonin neurotransmitter-এর অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ সমস্যা তৈরি করে। বেশিরভাগ সময় পরিবেশগত কারণগুলি ও জৈবরাসায়নিক কারণ যৌথভাবে বিষণ্ণতার জন্ম দেয় কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মনে।

তবে অনেক সময় বাইরের পরিবেশগত কারণ ছাড়াও বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে জৈবরাসায়নিক ভারসাম্যের সমস্যাই মুখ্যত দায়ি।

বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে সাহায্য করবেন শিক্ষকশিক্ষিকা

১. ছাত্র বা ছাত্রীটির সঙ্গো একান্তে কথা বলে তার মন খারাপ বা রাগের কারণ জানা ও তার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করবেন মন দিয়ে। আর সেই অনুযায়ী সমস্যার যুক্তিসম্মত সমাধানে তাকে সাহায্য করবেন।

২. তার অভিভাবকের সঙ্গো কথা বলে সমস্যা সমাধানের উপায় কী কী হতে পারে তা বোঝার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে মনোরোগ চিকিৎসকের সাহায্য নিতেও বলবেন।

৩. কথা বলার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার সেই ছাত্র বা ছাত্রীর মনে আত্মহত্যার কোনো চিন্তা রয়েছে কিনা। যদি জীবনের প্রতি অনীহা কোনোভাবে ছাত্র বা ছাত্রীর কথাবার্তায় প্রকাশ পায় তাহলে সেই ভাবনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেই ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবককে অবিলম্বে ডেকে পাঠিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে তাকে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেওয়া দরকার।

পরিশিষ্ট - ১০ দেখুন।

(খ) আচরণজনিত সমস্যা (BEHAVIOURAL DISORDER)

আচরণের সমস্যায় আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের কোনো কোনো আচরণ অন্যদের চোখে সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ে। অনেক সময় অন্যের ক্ষতিও করে বসে তারা। কিন্তু, তার জন্য সেই ছাত্র বা ছাত্রীর মনে কোনো অনুতাপ হয় না। নিজেরা কোনো কষ্টও অনুভব করে না আচরণের এই সমস্যার জন্য। ক্ষতিকর পরিণতি (negative consequences)-র কথা জানা থাকলেও বার বার এ ধরনের নানান ক্ষতিকর আচরণ করতে থাকে তারা।

এখানে আমরা যে তিনটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো সেগুলি আচরণের সমস্যা হিসাবেই পরিচিত।

A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

B. Conduct Disorder

C. Oppositional Defiant Disorder

A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Attention Deficit (অ্যাটেনসন ডেফিসিট) কথাটির বাংলা হল—মনঃসংযোগে অক্ষমতা বা মনোযোগ দেওয়ার অক্ষমতা। এখানে মনঃসংযোগে অক্ষমতা শুধুমাত্র পড়াশোনায় নয়, দৈনন্দিন কাজকর্ম, খেলাধুলা—এসব কিছুতেই। একে Attention Deficit Disorder (ADD) বলা হয়। ADD বা মনঃসংযোগে অক্ষমতা যে ছেলেমেয়েদের থাকে তাদের মূল সমস্যা হল কোনো কিছুতেই বেশিক্ষণ ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারে না তারা। খুব অল্পতেই মন অন্যদিকে চলে যায়। বেশিক্ষণ ধরে কোনো কিছু করা, দেখা বা শোনায় মন থাকে না তাদের।

বেশিরভাগ সময়ে Attention Deficit Disorder-এর সঙ্গে আরও একটি সমস্যা থাকে যা Hyperactivity (হাইপারঅ্যাকটিভিটি) নামে পরিচিত। এই সমস্যা যাদের মধ্যে থাকে সেই ছেলেমেয়ে অতিমাত্রার দুরন্ত হয়ে থাকে। অনেকসময় কোনো কিছু না ভেবেই হঠকারী (impulsive) কাজকর্মও করে ফেলে। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক কথায় দুর্ঘটনাপ্রবণ হয় তারা।

বহুক্ষেত্রে ADD/ADHD-র সঙ্গে লেখা পড়া সংক্রান্ত কিছু সমস্যা (Learning disability) দেখা যায়। অনেক সময় ADD/ADHD-র সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও অপরাধপ্রবণ আচরণের সমস্যা, অস্বাভাবিক জেদ কিংবা আবেগজনিত সমস্যাও চোখে পড়ে।

“ক্লাস ফাইভ-এর মিতুল সম্পর্কে তার স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষকই মনে করেন, ছেলেটি অত্যধিক দুরন্ত আর একেবারেই অমনোযোগী। ওর দ্বারা লেখাপড়া হওয়া খুব কঠিন।

একজন শিক্ষক পরামর্শ দিলেন, “একদিন ধরে আচ্ছা করে পেটালে দেখবেন আপনা-আপনি ঠান্ডা হয়ে গেছে। তখন সব ঠিকঠাক করবে।”

মিতুল সম্পর্কে শিক্ষকমশাইদের এই ভাবনা চিন্তার কারণগুলো একটু খুঁজে দেখা যাক।

মিতুল সত্যিই বেশ দুরন্ত। এক জায়গায় কিছুক্ষণ শান্তভাবে ওকে বসিয়ে রাখা যায় না। সবসময়ই কিছু না কিছু ও করছে। ক্লাসে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে যখন এক জায়গায় বসে থাকতে বাধ্য হয়, তখনও ওর হাত পা স্থির থাকে না। তারপর ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেঞ্চ থেকে উঠে শুরু করে দেয় এদিক সেদিক ছুটোছুটি। পড়াশোনা, খেলাধুলা, গান বা গল্প শোনা — এ ধরনের বহু কাজেই ও ঠিকমতো মন দিতে পারে না বেশিক্ষণ। তবে টেলিভিশনে কার্টুন ফিল্ম দেখাটা বেশ পছন্দ করে এবং মন দিয়ে দেখেও।"

❒ **অমনোযোগী/অতিচঞ্চল ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষকশিক্ষিকারা কী করবেন :**

প্রথমেই জেনে রাখা দরকার, ADD/ADHD-তে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের আচরণের সমস্যা ইচ্ছাকৃত নয়, তাদের নিজেদের আচরণের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ইচ্ছে থাকলেও কোনো জিনিসে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না, কিংবা স্থির হয়ে বসতে পারে না। তাই অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বিশেষ কিছু পদ্ধতির সাহায্যে এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো দরকার। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী চললে কিছুটা ফল যে পাওয়া যায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই পদ্ধতিগুলির কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হল—

১. খেলা

ADD/ADHD-তে আক্রান্ত শিশুদের বয়স অনুযায়ী, বিভিন্ন খেলনার সাহায্যে তাদের মনোযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। যদিও এই প্রক্রিয়া একেবারে ছোটোদের ক্ষেত্রেই ফলদায়ক হবে। ছবি রঙ করা, পাজল-এর সমাধান করা, দাবা—এই ধরনের মনোযোগ বৃদ্ধির সহায়ক বিভিন্ন কাজ বা খেলা সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র বা ছাত্রীটিকে সাহায্য করবে।

২. উৎসাহ দেওয়া

লক্ষ করে দেখতে হবে, শিশুটি কোন্ বিষয়ে বা কাজে তুলনামূলকভাবে একটু বেশি মনোযোগ দিতে পারে। সেই বিষয় বা কাজটিতেই আরও বেশি মনোযোগ দিতে তাকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

৩. ছোটোখাটো পুরস্কার

শিশুটি কোনো বিষয়ে একটু বেশি সময় মনোযোগ দিতে পারলে কিংবা অতিচঞ্চলতা ও হঠকারিতা কমাতে পারলে তাকে উৎসাহিত করা এবং কখনো কখনো পুরস্কৃত করা দরকার। এর ফলে নিজের আচরণ পরিবর্তনের একটি তাগিদ তার মনে সৃষ্টি হতে পারে।

৪. মনোযোগ বৃদ্ধি — একটি থেকে আর একটিতে

ADHD-আক্রান্ত শিশুর মনোযোগের ক্ষমতা যদি কোনো একটি বিষয়েও বাড়ানো যায়, তবে তা অন্য বিষয়েও প্রসারিত করা যাবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

মনোযোগের সমস্যা রয়েছে এমন একজনকে প্রথমে সহজ কিন্তু আকর্ষণীয় পাজল দেওয়া হল। সেই পাজলটি সে সফলভাবে সমাধান করার পর তাকে প্রশংসা করা হল। এরপর তাকে ক্রমশ কঠিনতর পাজল

দেওয়া হতে থাকলো এবং অবশ্যই কখনও প্রশংসা, কখনও পুরস্কার। এইভাবে যখন দেখা গেল সে বেশ কিছু সময় পাজল সমাধান করার জন্য দিতে পারছে, তখন তাকে খুব আকর্ষণীয় কোনো ছবিওয়ালা গল্পের বই কিংবা দাবা জাতীয় কোনো খেলার দিকে আকৃষ্ট করার কথা ভাবতে হবে। এইভাবে ক্রমশ দেখা যাবে তার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা সম্প্রসারিত হচ্ছে একটি ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে।

৫. বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি

অতিচঞ্চল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। তারা বেশি সময় এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। একসঙ্গে অনেকটা পড়া তাদের পক্ষে কঠিন। এই পরিস্থিতিতে তার সমস্যার কথা মনে রেখে একই জায়গায় অনেকক্ষণ বসতে বাধ্য না করে একটু স্বাধীনতা তাদের দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা একটু ঘুরে এসে আবার কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে বসতে পারে। পড়ার ক্ষেত্রেও খুব ছোটো ছোটো অংশ দিয়ে তাদের পড়ানোর কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

৬. দল বেঁধে সৃজনমূলক কাজ

এই ধরনের সমস্যা যদি একই ক্লাসে বেশ কয়েকজনের মধ্যে থাকে, তাহলে তাদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ করে দলবন্ধ নানান সৃজনমূলক কাজকর্ম (যেমন—বাগান করা, ছবি আঁকা, স্কুল পরিষ্কার করা, ক্লাসঘর সাজানো প্রভৃতি) শুরু করা যেতে পারে। তবে কাজগুলো তাদের ভালো লাগছে কিনা বা আনন্দ দিচ্ছে কিনা, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭. রুটিন মেনে চলা

প্রতিদিন সময় মেনে নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী চলার বিষয়ে উৎসাহ দিতে অভিভাবকদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

৮. শারীরিক শ্রমের খেলা

ADD/ADHD-তে আক্রান্ত শিশু কিশোরদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলার সুযোগ থাকা দরকার। যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম হয়—এমন খেলার ব্যবস্থাই এক্ষেত্রে ভালো (যেমন—সাঁতার, ফুটবল, কবাডি, টেনিস, ভলিবল প্রভৃতি)। এই ধরনের পরিশ্রমসাধ্য খেলার মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে জমে থাকা এনার্জির সঠিকভাবে ব্যবহার সম্ভব হয়।

৯. অনেক সময় অন্যায় আবদার বা জেদ এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতাকে প্রথম থেকেই প্রশ্রয় না দেওয়াটা খুব জরুরি।

১০. মারধোর বা নেতিবাচক সমালোচনা নয়, ভালো আচরণগুলোকে প্রশংসা করলে সেগুলোই আবার করার উৎসাহ বাড়ে। ফলে নিজে থেকেই দুর্ব্যবহার কমতে থাকে।

১১. ADD/ADHD-তে আক্রান্ত শিশু-কিশোরদের অত্যধিক চঞ্চলতা, মনোযোগের অক্ষমতার জন্য মস্তিষ্কের মধ্যেকার জৈবরাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ভূমিকার কথা আমরা আগেই আলোচনার মাধ্যমে

জেনেছি। এই জৈবরাসায়নিকের কাজে শৃঙ্খলা আনার জন্য ওষুধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য বর্তমানে কিছু উন্নতমানের ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে।

তাই বলা যেতে পারে, সমস্যাগ্রস্ত শিশু-কিশোরটির আচরণ সংশোধনের ব্যবস্থা চলার পাশাপাশি কোনো মনোযোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিন।

B. Conduct Disorder

"দীপন ক্লাস নাইনের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় এবারে পাশ করতে পারেনি। পাশ যে করবে না, তা ও নিজেও জানত। পড়াশোনা একেবারেই করেনি। স্কুলের নাম করে প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরোত, ফিরেও আসত স্কুল ছুটির সময় পেরিয়ে গেলে। কিন্তু, স্কুলের হাজিরা খাতায় প্রায় দিনই অনুপস্থিত থাকত। অন্যায়ভাবে অন্য ছেলেদের বিরক্ত করা, মারধোর করা, বন্ধুদের বই চুরি করা — এসব ওর অভ্যাস পরিণত হয়েছিল। কারণে-অকারণে মিথ্যে কথা বলাটাও তার কাছে কোনো ব্যাপার নয়।

বাড়িতেও দীপন কোনো নিয়ম মেনে চলে না। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। ঘুমোয় আরও অনেক পরে। ফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠে সাড়ে নটা-দশটায়। পড়াশোনা নিয়ে কোনো কথা বললেই রেগে যায়। অনেক সময় রাগে বাড়ির জিনিসপত্রও ভাঙচুর করে। খাওয়া-দাওয়াও করে নিজের ইচ্ছে মতো সময়ে। আজেবাজে নেশা করার অভ্যেসও নাকি তার রয়েছে বলে শোনা যায়।"

Conduct Disorder হল ধারাবাহিক এক ধরনের আচরণের সমস্যা যা—অন্যের ক্ষতি করে অথবা নির্দিষ্ট বয়সের সামাজিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে। বর্তমানে শিশু ও কিশোর অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এই Conduct disorder-এরই প্রকাশ। আচরণের এই সমস্যাটির বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি—

১. আক্রমণাত্মক আচরণ যা অন্য ব্যক্তি কিংবা প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে।

২. আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু ধ্বংসাত্মক আচরণ যা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করতে পারে।

৩. চুরি করা, মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস।

৪. গুরুতর আইনশৃঙ্খলা ভাঙার কাজ।

Conduct Disorder-এ আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষকশিক্ষিকারা কী করতে পারেন?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, Conduct disorder-এর মতো একটি সমস্যা, যেখানে নানান psychosocial factors বিশেষভাবে দায়ি — সেখানে শিক্ষকশিক্ষিকাদের পক্ষে আদৌ কি কিছু করা সম্ভব?

হ্যাঁ সম্ভব। শিশু-কিশোরদের একটা পর্যায় পর্যন্ত অন্তত শিক্ষকশিক্ষিকারা ভালোমতোই সাহায্য করতে পারেন। তবে তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, সময় এবং আন্তরিকতা।

শিক্ষকশিক্ষিকারা যা পারেন —

১. সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র বা ছাত্রীটির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক তৈরি করুন। এর ফলে সে নিজেকে আর

অবহেলিত বোধ করবে না, তার মনে নিরাপত্তাবোধও ফিরে আসবে। শিক্ষকশিক্ষিকা আন্তরিক সমানুভূতি (empathy)-র দ্বারা তাকে বোঝার চেষ্টা করবেন — যা যে কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মনের একান্ত প্রত্যাশা। এর ফলে তার মনের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে হলেও সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকার প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধতা তৈরি হবে।

২. তাকে তার পরিবার এবং বন্ধুদের সম্পর্কে একান্তে বসে কিছু বলার জন্য উৎসাহ দিন। এর ফলে অনেক অজানা দিক জানা যেতে পারে।

৩. তার সমস্যা নিয়ে তার অভিভাবক/অভিভাবিকার সঙ্গে কথা বলুন এবং সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করুন।

৪. একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং লক্ষ্য ঠিক রেখে এগোনোর চেষ্টা করুন।

৫. Conduct Disorder-এর কারণগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

৬. সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন, ছাত্র/ছাত্রীটিকে নেতিবাচক সমালোচনার মুখে ঠেলে না দিয়ে তাকে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, অন্যান্য সৃজনমূলক কাজকর্মে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হতে নিরন্তর উৎসাহ দেওয়া, নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া — যাতে সে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

৭. সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে যাতে 'খারাপ ছেলে' বা 'খারাপ মেয়ে' না বলা হয় সেদিকে লক্ষ রাখুন।

৮. এগুলির পাশাপাশি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে Conduct Disorder-এর লক্ষণগুলি চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয় — এই তথ্যটি তার অভিভাবকদের জানিয়ে দিন।

C. Oppositional Defiant Disorder

ইদানীং অনেক বাবা মা-ই অভিযোগ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা অবাধ্য, জেদি, কারও কথা শোনে না, মুখে মুখে তর্ক করে.....ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যাটি মনের, যা Oppositional Defiant Disorder নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানে চিহ্নিত।

Oppositional Defiant Disorder বা সংক্ষেপে ODD আসলে আচরণের সমস্যারই আর একটি দিক। এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীর আচরণ ধারাবাহিকভাবেই সমস্যা তৈরি করতে থাকে। বিশেষ করে বাড়িতে বাবা মা বা বয়স্ক কোনো ব্যক্তির সঙ্গে/স্কুলে শিক্ষকশিক্ষিকা, ক্লাস মনিটরের সঙ্গে/ খেলার মাঠে বা ক্লাবে ওই রকম যদি authority figure কেউ থাকে, তবে তার সঙ্গে।

এই সমস্যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীর নীচের আচরণগুলির মধ্যে —

- ✦ বড়োদের সঙ্গে প্রায়ই তর্ক করা, সবকিছুতেই বিরোধিতা করা, অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করা
- ✦ একটুতেই মেজাজ হারানো
- ✦ প্রচলিত নিয়ম ইচ্ছে করে না মানা, বড়োদের অনুরোধ মেনে চলতে অস্বীকার করা, অস্বাভাবিক জেদ এবং রাগ

- ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা
- প্রায়ই নিজের দোষত্রুটি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া
- অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা — একটুতেই বিরক্ত বোধ করা, অন্যের কথায় খুব সামান্য কারণেই রেগে যাওয়া, অপমানিত বোধ করা
- মাঝে মাঝেই আক্রোশপূর্ণ, প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করা।
- ODD - আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ খুব ঘন ঘন দেখা যায়।
- এই আচরণগুলি তাদের বয়সের সাপেক্ষে অস্বাভাবিক।

শিক্ষকশিক্ষিকারা এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কী করতে পারেন?

১. ছাত্র/ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। তার ইতিবাচক দিকগুলিকে উৎসাহ দিন। নেতিবাচক আচরণগুলি যে তার 'ভালো ইমেজ'-এর পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে তা বন্ধুত্বমূলকভাবে তাকে বুঝতে সাহায্য করুন।

২. বাবা-মা/অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলুন ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে। মারধোর বা শুধু নেতিবাচক সমালোচনার পরিবর্তে তার ইতিবাচক দিকগুলিকে উৎসাহ দিতে পরামর্শ দিন। নেতিবাচক আচরণগুলিকে উপেক্ষা করা এবং পরিবারে তাকে কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়ার জন্যও পরামর্শ দিন। বাবা-মা, অভিভাবকের নেতিবাচক আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলুন।

পরিশিষ্ট - ১১ দেখুন।

১.৩৭ শারীরিক শাস্তি—বিকল্প পথ

[গত ডিসেম্বর মাসে (২০০৮) অনুষ্ঠিত 'সদর্থক স্কুল পরিবেশ' তৈরি সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রয় ৪০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই স্কুলপ্রধান বা সহপ্রধান। কর্মশালার শুরুতে যে need assessment করা হয় তাতে অনেকেই শারীরিক শাস্তির বিকল্প কী হতে পারে এ সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা পেতে চান। এর জন্য কর্মসূচির মধ্যে একটি পর্বে সঞ্চালক প্রাথমিক কিছু বক্তব্য রাখার পর দলগত আলোচনা হয় এবং শিক্ষকদের এই আলোচনা থেকেই বেশ কিছু পরামর্শ বা মতামত উঠে আসে শারীরিক শাস্তির বিকল্প হিসাবে।]

কর্মশালার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার যে কথাটা উঠে এসেছে তা হল এই যে স্কুলের পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শাস্তিবিধান বেআইনি, অনৈতিক ও ক্ষতিকর। প্রায় ১০০টি দেশে এটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা, চেক প্রজাতন্ত্র এবং ভারতবর্ষেও স্কুলে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ হয়েছে।

২০০১ সালে রাষ্ট্রসংঘের উচ্চ মানবাধিকার কমিশনার ঘোষণা করেন **"No form of violences including physical, sexual or psychosexual can ever be justified as being in the best interests of the child"** সেইসঙ্গে এও ঘোষণা করেন যে শিশুদের শারীরিক শাস্তিবিধান একপ্রকারের মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

গত দু'দশকে শারীরিক শাস্তি বিষয়ে অসংখ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়েছে। Columbia University থেকে পরিচালিত এক গবেষণায় এরকম ৮৮টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের এক মূল্যায়নে আমরা জানতে পারি, শৈশব বা কৈশোরে শারীরিক শাস্তির সাথে কিশোরমনে অপরাধপ্রবণতা, আগ্রাসী মনোভাব, সমাজবিরোধী আচরণের প্রবণতা, মূল্যবোধের অবনমন এবং সামগ্রিকভাবে শৈশবে এমনকি তাদের বড়ো হওয়ার পরেও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সার্বিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

বিপরীতে একটিও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে শারীরিক শাস্তির কোনও বিশেষ উপযোগিতার উল্লেখ নেই। শারীরিক শাস্তি কাউকে দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করে বা বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় অথবা শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা আনতে সাহায্য করে — এ সব ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই।

সামগ্রিকভাবে শারীরিক শাস্তির নেতিবাচক প্রভাব, (তা তাৎক্ষণিকই হোক বা বেশ কিছু সময় পরেই হোক) তার আপাত উপযোগিতার থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি।

শারীরিক শাস্তির অসংখ্য নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য হল :

- স্কুলের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি করা।

• ছাত্রশিক্ষকের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ককে নষ্ট করা, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশকে বিঘ্নিত করা।

• শারীরিক আগ্রাসনকে সঠিক বলে মনে হওয়া এবং শিক্ষক থেকে ছাত্রে এই মনোভাবের সংক্রমণ হওয়া। এভাবে সামাজিক হিংসার বিস্তারে ইন্ধন যোগানো।

প্রকৃতপক্ষে শারীরিক শাস্তির শিক্ষাবিরোধী ভূমিকাই বেশি — বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের নির্যাস এটাই।

তবু একথাও মনে রাখা দরকার যে—

• বেশিরভাগ স্কুলেই, বিশৃঙ্খলা একটা সত্যিকারের প্রাত্যহিক সমস্যা।

• 'শাস্তি' বহু শিক্ষক এবং ছাত্রের 'বড়ো হয়ে ওঠার' অভিজ্ঞতায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

• অল্প হলেও বেশ কিছু শিক্ষকের কাছে 'শৃঙ্খলাবোধ' এক গুরুতর সমস্যা। ফলে তাঁদের পক্ষে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনা একটু বেশি কঠিন বলে মনে হতে পারে।

• পরিবর্তন আনা, তা সে যে-কোনো কিছুরই মধ্যে হোক, আনা বেশ কঠিন এবং শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা আনা এবং সেটাকে ধরে রাখার পিছনে আলাদা করে চিন্তা করা দরকার এবং সেজন্য যথেষ্ট সময় এবং ধৈর্যের প্রয়োজন।

অনেক ধরনের উদ্যোগ সত্ত্বেও শারীরিক শাস্তির বিধান অলিখিতভাবে আমাদের রাজ্যে বেশ কিছু বিদ্যালয়ে বর্তমান। শারীরিক শাস্তির টিকে থাকার মূলে যে বর্তমান প্রেক্ষাপটটি রয়েছে তার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সংক্ষেপে সেগুলি এখানে আমরা তুলে ধরতে চাইছি।

ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থী সংখ্যা : শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই এই রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়-সংখ্যা, শিক্ষক-সংখ্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থী-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাজ্যস্তরের বিভিন্ন শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচির ফলে শিক্ষার্থী-সংখ্যা বৃদ্ধির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এবং ছাত্র-পরিকাঠামো অনুপাত কাম্য মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি। একথা অনস্বীকার্য যে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী-সংখ্যা সুষ্ঠুভাবে শ্রেণিকক্ষে কাজ পরিচালনায় বাধাস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাদের বাড়তি চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। বিশেষত, এই রাজ্যে শিখন শেখানো এবং মূল্যায়ন-সংস্কারের যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে — তার যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বাড়তি চাপ যাতে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নশীল হতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খেলাধুলোর জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিসর ও সুযোগের অভাবে ছাত্রছাত্রীর মধ্যেকার অফুরন্ত এনার্জির বহিঃপ্রকাশ ঘটে শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই বা আশেপাশে অস্থিরতা ও অতি-দুরন্তপনার আকারে। অত্যধিক পড়ুয়ার সংখ্যা অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা (Participatory learning)-র ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ফলে শিক্ষার্থীর আগ্রহে ঘাটতি দেখা যায়, অস্থিরতা বাড়ে, বাড়ে অন্যদের বিরক্ত করার প্রবণতাও। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়গুচ্ছের ধারণায় আমরা খুঁজে পেতে পারি সমাধানসূত্র।

দ্রষ্টব্য : প্রশিক্ষণ সহায়িকা — নতুন অভিমুখ, বিদ্যালয়গুচ্ছ ঃ ধারণা ও প্রয়োগ।

দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা :

আমরা আমাদের এই সমাজে যেভাবে বড়ো হয়ে উঠেছি সেখানে সর্বত্রই সম্পর্কগুলিকে ক্ষমতার নানা বিন্যাসে আবর্তিত হতে দেখেছি। ক্ষমতার এই বিন্যাসে শিশুর অবস্থান প্রায় সবার নীচে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নটি এখানে অন্তর্হিত হয়ে ক্ষমতার সামন্ততান্ত্রিক রূপটিই প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। শিশু অধিকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা আমাদের আচরণে অন্তত প্রকাশ পায় না। পরিবারে কিংবা বিদ্যালয়ে বড়োদের সামন্ততান্ত্রিক চেহারাটাই যেন প্রকট হয়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে তাই অনায়াসে পিতামাতা হিসাবেই হোক বা শিক্ষকশিক্ষিকা হিসাবেই হোক — আমাদের শিশুর প্রতি নিপীড়নমূলক মনোভাবে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অগণতান্ত্রিক রূপটিই প্রকাশ পায়।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারলে শিশুর আত্মমর্যাদার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠা সহজ হবে আমাদের পক্ষে।

ক্রমবর্ধমান নানা চাপ : শিক্ষক মনে তার প্রভাব

নিয়ত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, পণ্য-সংস্কৃতি প্রভাবিত ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনবোধ (যে প্রয়োজনবোধ যুগপৎ শরীর ও মনের আন্তঃক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে, নিত্যনতুন পণ্যের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে চলে), ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ, প্রাত্যহিক নানাবিধ সমস্যা। উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা-সংক্রান্ত সমস্যা, বিষণ্ণতা প্রভৃতিতে আক্রান্ত শিক্ষকশিক্ষিকাদের মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

মন যদি ঠিক না থাকে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যেমন আবেগ-অনুভূতির ওপর তেমনি অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং পেশাগত জীবনের ওপরেও।

ক্রমবর্ধমান নানা চাপে বিপর্যস্ত মন অনেক সময় নিজের নেতিবাচক আবেগকে সামাল দিতে ব্যর্থ হয় তখন তার প্রভাব পড়ে শ্রেণিকক্ষে কিংবা স্টাফরুমেও।

ওপরের এই সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন থাকতে পারে, থাকতে পারে সংশয়। কিন্তু, সম্পূর্ণত এই সীমাবদ্ধতাগুলির বাস্তবতাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না।

এই সীমাবদ্ধতাগুলি সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমুক্ত সদর্থক পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষকশিক্ষিকার ভূমিকা অপরিসীম।

শারীরিক শাস্তি টিকে থাকার মূলে বেশ কিছু সম্ভাব্য কারণও বর্তমান, যেগুলিকে আমরা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না। সেই বর্তমান প্রেক্ষাপটটি আমরা দেখে নিতে পারি। দেখে নিতে পারি কয়েকটি বাস্তব সীমাবদ্ধতাও।

বিদ্যালয় পরিবেশ তথা শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় ও দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষক তাদের guidance (পরামর্শ) দিতে পারেন যাতে তারা সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার সাথে প্রত্যেকে অপরের অধিকার রক্ষার কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

নেতিবাচক শাস্তি নয়, মূল লক্ষ্য যদি থাকে গঠনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে স্কুলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা তাহলে শৃঙ্খলাপরায়ণতা স্কুল শিক্ষকের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসতে পারে যেখানে সেটা ইতিবাচক শিখন প্রক্রিয়ারই একটা অংশ। এরজন্য দরকার এক মূল্যবোধ ও মানসিকতা যা শান্তি, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মানবাধিকার — এসবেরই প্রতি দায়বদ্ধ।

শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষায় আমরা কী ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করি— নীচের টেবিলটি এ ব্যাপারে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি (Insight) পেতে সাহায্য করতে পারে।

ইতিবাচক (গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি — যা সংশোধনের সহায়ক)	নেতিবাচক (শাস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি — যা সংশোধনের পক্ষে ক্ষতিকারক)
1. আপনি শিক্ষার্থীর মধ্যে যা কিছু ভালো সেইদিকটায় বেশি খেয়াল রাখেন। শিক্ষার্থীর কাছে সম্ভাব্য বিকল্পগুলি তুলে ধরেন এবং তাকেই দায়িত্ব দেন সবচেয়ে ভালো বিকল্পটিকে বেছে নিতে।	1. শিক্ষার্থীর নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দিকেই বেশি নজর দেন। ***কী করবে না*** —সেটাই তাকে নির্দেশ দেন।
2. শিক্ষার্থীর চেষ্টাকে প্রশংসা করেন। প্রকাশ্যে তার গুণপণার উল্লেখ করেন এবং বাহবা দেন।	2. শিক্ষার্থীকে Control (নিয়ন্ত্রণ) করার চেষ্টা করেন। শিষ্টতার অভাব দেখলেই শাস্তি দেন।
3. আপনি সৌজন্যবোধ ও শ্রদ্ধাশীলতায় আস্থা রাখেন। মুখের এবং শারীরিক ভাষায় আপনি অহিংস নীতি মেনে চলেন।	3. ক্ষমতা প্রদর্শনে অভ্যস্ত। অশ্রদ্ধা, শ্লেষাত্মক মন্তব্য, অপমান করা, মারধোর করা এসবে আপনি স্বচ্ছন্দ।
4. ছাত্রছাত্রীর আচরণের বিচ্যুতি হলে সেটা সহমর্মিতার সাথে বোঝার চেষ্টা করেন। প্রেক্ষিত, অনুষঙ্গ, বয়স, এইসব কিছুই অনুধাবন করার চেষ্টা করেন।	4. অত কিছু ভাবার চেষ্টা করেন না। শাস্তি দেওয়াটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে আসে - রিফ্লেক্সের মতো। ফলে অনেকক্ষেত্রেই তা অযৌক্তিক এবং অপরিমিত।
5. বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে যা তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণে এবং সঠিক পথে চলতে সাহায্য করতে পারে। এই বিশ্বাস আপনি তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন।	5. মনে করেন ছাত্রছাত্রীদের বড়োদের Control (অধীনে)-এ থাকা দরকার।
6. ছোটোখাটো ভুলত্রুটি কখনো-কখনো ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যান বা আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন।	6. ত্রুটি হলেই তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া জানান। শাস্তি দিয়ে তা ঠিক করার চেষ্টা করেন।

ইতিবাচক (গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি — যা সংশোধনের সহায়ক)	নেতিবাচক (শাস্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি — যা সংশোধনের পক্ষে ক্ষতিকারক)
7. ভুলকে 'শেখার সুযোগ' হিসেবে দেখেন। শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেন যাতে নিজেদের ভুল নিজেরাই বুঝতে পারে, দুঃখবোধ থেকে নিজেদের ত্রুটি ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ পায়।	7. ক্ষমাহীনতা ভুল সংশোধনের উপায় হিসাবে দেখেন।
8. ত্রুটির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নয়, তার আচরণের দিকেই নজর দেন।	8. শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবেই সমালোচনার কেন্দ্রে এনে ফেলেন। শুধু তার আচরণ নয়, সামগ্রিকভাবে সেই শিক্ষার্থীকে মানুষ হিসাবেই খারাপ বলে মনে করেন।
9. যদি কখনও ধৈর্য হারিয়ে তাৎক্ষণিক ক্রোধের বশে রূঢ় আচরণও করেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন। ঠিক-ভুল বোধ, আত্মপ্রত্যয় আর সহমর্মিতার মেলবন্ধন —আপনাকে শিক্ষার্থীর আস্থা নতুন করে অর্জন করতে সাহায্য করে।	9. ভুল বুঝতে অসুবিধা হয় বা বুঝতে পারলেও দুঃখপ্রকাশ করাকে দুর্বলতা বলে মনে করেন।

শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা — কিছু নির্দিষ্ট ধারণা

পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও আস্থার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে যে পরিবেশ তৈরি হয় সেখানে বিদ্যার্থীরা অনেক স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদবোধ করবে। এমতাবস্থায় বাইরে থেকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজন কমবে এবং তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল হয়ে আত্মশৃঙ্খলা অভ্যাসে মনোযোগী হবে।

কীভাবে আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি? কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী 40 জন শিক্ষকশিক্ষিকা 4টি দলে ভাগ হয়ে এব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে তাঁদের মতামত বৃহত্তর Group এর কাছে পেশ করেন। এর সঙ্গে আরও কিছু ধারণা যুক্ত করে আমরা শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষায় কিছু বিকল্প ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়ে নিজস্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী এর সংশোধন / সংযোজন / বিয়োজন করে নিতে হতে পারে।

১. শৃঙ্খলা শুধুমাত্র একটি মাত্র শ্রেণিকক্ষের নয়, সারা বিদ্যালয়ের ব্যাপার

শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় সামগ্রিক শৃঙ্খলাবোধে একটা সাযুজ্য চাই। এরজন্য অভিভাবক, পরিচালন সমিতি, স্টাফ কাউন্সিল সকলে মিলে নিয়মিত আলোচনা করা প্রয়োজন। এর থেকে নতুন ধারণা উঠে আসবে, যেগুলো প্রয়োগ করা হবে। তার মূল্যায়ন হবে এবং দরকার হলে পরিবর্তন করা হবে। দরকার হলে আলোচনায় উপযুক্ত ছাত্রপ্রতিনিধিদের যোগ দিতে আহ্বান করা যেতে পারে।

২. কিছু প্রাথমিক নিয়মকানুনের (Ground Rules) প্রবর্তন আবশ্যিক

বছরের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে শৃঙ্খলা বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে পালনীয় নিয়মাবলি প্রস্তুত করা। এবিষয়ে শ্রেণিশিক্ষক উদ্যোগ নিয়ে শ্রেণির সবাইকে যুক্ত করে আলোচনা করতে পারেন।

উদাহরণ : দক্ষিণ আফ্রিকার একটি স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই নিয়মাবলিটি নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করেছে।

- শ্রেণিকক্ষে পড়াশুনা চলাকালীন যতদূর সম্ভব নীরবতা রক্ষা করা অথবা খুব আস্তে কথা বলা যাতে অন্যদের মনোনিবেশে কোনও অসুবিধা না হয়।
- অন্যে কথা বললে শোনা অভ্যাস করা, কথার মধ্যে কথা না বলা।
- পরস্পরকে সহযোগিতা করা।
- অন্যের সঙ্গে ভাবনার আদানপ্রদান করা।
- অন্যদেরকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদের ব্যক্তিগত অভিমতকে (সায় না থাকলেও) সম্মান করা।
- প্রথমে ভাবা, তারপর করা।
- ঠিক সময়ে ক্লাসে আসা।
- সমস্ত হোমওয়ার্ক ঠিক সময়ে শেষ করা।

৩. শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করা

৪. যথেষ্ট পরিমাণ সহপাঠ্যক্রমিক (Co-curricular) ও সৃজনমূলক কার্যাবলির ব্যবস্থা করা

খেলাধূলা, নাটক, আবৃত্তি, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা, Puzzle সমাধান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের বিশেষ করে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রণোদিত করা।

৫. শিখন প্রক্রিয়াকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দদায়ক করা ও সম্ভব হলে নিয়মিত শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

৬. শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা করা। আলোচনা হওয়া উচিত আন্তরিক ও গঠনমূলক। যেন নিছক দোষারোপে বা লঘু আলোচনায় পর্যবসিত না হয়।

৭. সমস্যা সৃষ্টিকারী ছাত্রদের সম্বন্ধে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আরও খবরাখবর নেওয়া ও প্রয়োজনে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা। প্রকৃতপক্ষে যতদূর সম্ভব সাধারণভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা খুব জরুরি। এ ব্যাপারে স্কুলকে হয়তো একটু বেশি উদ্যোগ নিতে হতে পারে।

৮. শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা হলে এর কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হতে হবে।

শিক্ষার্থীর বন্ধুস্থানীয় কাউকে যাকে সে পছন্দ করে অথবা কোনও শিক্ষকশিক্ষিকা যার কথা সে একটু বেশি মান্য করে তার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৯. বর্তমান জীবনযাপনের পারিবারিক / সামাজিক / অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধারার (trends) কী প্রতিক্রিয়া শিশুমনে পড়ছে এবং তাদের চিন্তন / আচরণগত নানা পরিবর্তন ঘটছে সেসব জটিল বিষয়ে অবহিত হবার জন্য এবং নিজেকে সেই অনুযায়ী প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষকশিক্ষিকাদের প্রয়োজন মতো পরামর্শদান (guidance), শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা (classroom management)-র প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা — যাতে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা সহজ হয়।

১০. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নিরপেক্ষতা : শ্রেণিকক্ষে একটি শিক্ষার্থীরও যেন এমন মনে না হয়, কোনো শিক্ষক কোনো বিশেষ শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য দেখাচ্ছেন।

সমস্ত আলোচনা আমরা মূলত শারীরিক শাস্তিকে কেন্দ্র করেই করেছি। তবে একথাও ভুললে চলবে না অনেক সময় শিক্ষকশিক্ষিকার রূঢ় আচরণ, কটুবাক্য / শ্লেষাত্মক মন্তব্য, অন্যের সঙ্গে তুলনা করা, হেয় প্রতিপন্ন করা, বৈষম্যমূলক আচরণ— এসবও ছাত্রছাত্রীর সংবেদনশীল মনে গভীরভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। **‘তুই-একটা গাধা’, ‘লিখে দিতে পারি, তোর দ্বারা কিছু হবে না,’ ‘অকম্মার ঢেঁকি’, ‘ফেলুবাবা’, “এসব ছেড়ে চায়ের দোকানে বা গ্যারেজে কাজটাজ দ্যাখ’, কিংবা ‘দ্যাখতো অমুক ছেলেটা / মেয়েটা ...... ওদের দেখেও একটু শেখ’** — এ জাতীয় মন্তব্য শিক্ষার্থীর আত্মপ্রতীতি বা self esteem এর উপর গুরুতর আঘাত হানতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ছাত্রছাত্রীকে আত্মবিধ্বংসী ভাবনায়ও ভাবিত করতে পারে।

পরিশিষ্ট - ১২ দেখুন।

১.৩৮ মানসিক চাপ ও তার প্রতিক্রিয়া

নাটিকা : উত্তরণ

সমীরবাবু একজন স্কুল শিক্ষক। বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে তাঁর স্কুল। আগে অটোয় করে মেট্রো স্টেশনে যেতে হয়। তারপর রিক্সায় করে স্কুলে পৌঁছান। সাড়ে দশটায় হাজিরা। তিনি অষ্টম শ্রেণির ক্লাস টিচার। বাড়িতে মা, বাবা, স্ত্রী সুনন্দা ও বছর বারোর ছেলে সুমিত আছে।

সকাল সাতটা। সমীরবাবু টেবিলে বসে খবরের কাগজ দেখছেন।

সমীরবাবু : কই গো, আর এক কাপ চা হবে নাকি, বেশ শীত পড়েছে।

সুনন্দা : দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো। এই তো খেলে এক কাপ। রান্নাও তো করতে হবে। বাজারে যাবে না?

সমীরবাবু : যাব না কেন? কখনও এমন হয়েছে তোমার বাজার করে দিই নি?

সুনন্দা : এই নাও চা। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাজারে যাও। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সমীরবাবু চায়ের পেয়ালা ধরে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন :

এই দ্যাখো, কাল রাতে আবার ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, ওফ্ কত মানুষ মারা গেল;

শচীন আবার আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে আউট। সত্যি, কারা যে এদের আম্পায়ার করে?

সত্যি, কাগজ খুলেই খালি খুন আর খুন আর ভালো লাগে না।

সুনন্দা (রান্না ঘর থেকে) : কই হলো তোমার চা খাওয়া? এখনও বাজারে গেলে না? খবরের কাগজ পেলে তোমার আর হুঁশ থাকে না। সোয়া আটটা বেজে গেছে, সে খেয়াল আছে।

সমীরবাবু : সোয়া আট! দাও, দাও, শিগ্‌গির ব্যাগ দাও, দশ মিনিটের মধ্যে বাজার থেকে ঘুরে আসছি।

সমীরবাবু সুনন্দার দেওয়া বাজারের থলে নিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। খানিক পরে বাজার নিয়ে ঢুকলেন।

সমীরবাবু : এই নাও তোমার বাজার। দাও তো দেখি আমাকে আর এক কাপ চা দাও তো। বেশ শীত পড়েছে! এক্ষুনি চানে ঢুকতে হবে।

সুনন্দা (ঝাঝিঁয়ে) : আবার চা। আচ্ছা, তুমি কি একটুও বোঝ না? আমি রান্না কখন করব? এখুনি খোকা বেরোবে-তার খাবার তৈরি করতে হবে, টিফিন তৈরি করতে হবে, তোমার খাবার তৈরি করতে হবে। তোমার চায়ের তেষ্টা আর মেটে না!

সমীরবাবু : আহা, দাও-ই না এক কাপ তৈরি করে। কী রকম ঠান্ডা পড়েছে, দেখ্‌ছো না?

সুনন্দা এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঢুকলেন।

সুনন্দা : এই নাও, খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি করো, আর দেরি করো না।

সমীরবাবু চা খেতে শুরু করলেন। সমীরবাবুর মা ঘরে ঢুকলেন।

মা : সমু, তোর বাবার শরীরটা কাল থেকে ভালো নেই। কাল থেকেই বেশ কাশছিলেন। আজ সকাল থেকে বেশ জ্বর আছে মনে হচ্ছে। প্রেশারটাও বেড়েছে মনে হচ্ছে।

সমীরবাবু (একটু রাগত ভাবে) : মা, এত্ক্ষণ বলো নি কেন? কাল সন্ধে বেলা বলতে পারতে না? তোমাদের সব কথা কি আমার স্কুলে যাবার সময় মনে পড়ে?

মা : কখন বলব? স্কুল থেকে ফিরেই তো পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসলি/তাছাড়া, বুঝতেও তো পারি নি ওঁর শরীর এতটা খারাপ হয়েছে।

ইতিমধ্যে সমীরবাবুর ছেলে খোকা ঘর থেকে বেরোল।

খোকা : বাবা এই অঙ্কটা চট্ করে একটু নামিয়ে দাও তো। পারছি না। আজ অঙ্কের ইউনিট টেস্ট আছে।

সমীরবাবু : আজ ইউনিট টেস্ট তো এতদিন কী করছিলি? কাল মনে ছিল না। খেলা ছাড়া পড়ার কথা কখনও মনে পড়লে তবে তো? বাবা তো আছে, করে দেবে।

খোকা (আব্দার করে) : দাও না, বাবা, নইলে পরীক্ষায় নির্ঘাত ফেল।

সমীরবাবু : এখন আমি পারব না। বাবার জন্য ডাক্তার ডাকতে যেতে হবে।

খোকা : যাবার কী দরকার? ডাক্তার কাকু-কে একটা ফোন করে দাও না।

সমীরবাবু : ও হ্যাঁ, তাই তো। মোবাইলটা আন তো।

খোকা মোবাইল নিয়ে এল। সমীরবাবু মোবাইল 'অন' করলেন।

সমীরবাবু : এই যা; ব্যালেন্স নেই। দূর ছাই, কাজের সময় যতো বাগ্ড়া।

খোকা : বাবা, একটু দেখিয়ে দাও না। তোমার পাঁচ মিনিট লাগবে।

সুনন্দা টিফিন হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সুনন্দা : একটু দেখিয়ে দাও না। তোমাকে ও পায় কখন যে আগে থাকতে বলবে?

সমীরবাবু : তুমি ছেলের হয়ে বলতে এসো না। ওর দোষ ঢাকতে যেও না। সারা দিন ফুটবলের মাঠে কাটিয়ে যখন সন্ধে সাতটার পর বাড়ি ফেরে তখন তো কই কিছু বল না। তাছাড়া, তুমিও তো ওকে নিয়ে একটু বসতে পারো। লেখা-পড়া তো শিখেছ। সব আমার উপর ছেড়ে দিয়ে কী করে চলে? এখন আমি ডাক্তার ডাকতে যাব, না ওকে অঙ্ক দেখাব?

সুনন্দা : ডাক্তারবাবু তো একটা পর্যন্ত থাকবেন। খোকাকে তো একটু পরেই বেরিয়ে যেতে হবে।

মা : বৌমা, এটা কি একটা কথা হল। একটা মানুষের এতো শরীর খারাপ, আর তোমার কাছে অঙ্ক দেখানোটা বড় হল। ডাক্তারবাবু কলে বেরিয়ে গেলে আর ওঁকে ধরা যাবে?

সুনন্দা কিছু বলতে গেলেন। সমীরবাবু তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললেন;

সমীরবাবু : তোমরা আর এখন ঝগড়া শুরু কোরো না। আমি দেখছি। তুমি ঘরে যাও, মা। আমি ডাক্তার দেখিয়েই স্কুলে যাব। আর বাবাকেও এতোবার বলেছি, সন্ধেবেলায় বেরোলে যেন মাথায় টুপিটা পরে যান। কখনও যাবেন না। এখন এই মাসের শেষ........

মা : টাকাটা-ই বড় হলো তোর কাছে?

সমীরবাবু : এটা শুধু টাকার কথা নয়, মা। কিন্তু একটু সাবধান তো হতে পারেন। আমি কি বলেছি, বাবার চিকিৎসা করাব না। আমায় আর রাগিয়ে দিও না, মা, তুমি ঘরে যাও। দে খোকা, তোর অঙ্ক বইটা দে। দেখি, কোন্ অঙ্কটা পারছিস না?

সমীরবাবু পাঁচ মিনিটে অঙ্কটা করে দিয়ে খোকার দিকে খাতাটা ছুঁড়ে দিলেন।

সমীরবাবু : এই নে, আমায় আর বিরক্ত করিস্ না। আর ভবিষ্যতে যদি সময় থাকতে থাকতে না বলিস্, তাহলে আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করিস্ না।

সমীরবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হন্ত-দন্ত হয়ে ডাক্তার-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। ডাক্তারবাবু সমীর বাবুর বাবাকে পরীক্ষা করছেন আর সমীরবাবু ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছেন।

সমীরবাবু (নিজের মনে) : সোয়া ন' টা। আর একদম সময় নেই। দেরি হলে তো......তেমনি এক কড়া হেডমাস্টার পেয়েছি। পাঁচ মিনিট দেরি হলেই সঙ্গে সঙ্গে লেট মার্ক বসিয়ে দেন। এমন সব কথা বলেন কান-মাথা গরম হয়ে যায়। এত একস্ট্রা কাজ করি, তার কোনো দাম নেই।

সমীরবাবু : কেমন দেখছেন, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার : খুব ভালো না। আসলে বয়স হয়েছে তো। নিউমোনিয়া বলে মনে হচ্ছে। এই টেস্টগুলো করিয়ে নিন,আর এই ওষুধগুলো নিয়ে এসে এখুনি খাওয়াতে শুরু করুন।

সমীরবাবু : ঠিক আছে, ডাক্তারবাবু, আমি এখুনি ওষুধ নিয়ে আসছি।

সমীরবাবু পকেট থেকে টাকা বের করে ডাক্তারবাবুর ফি দিয়েই তাঁর সঙ্গেই হন্ত-দন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ওষুধ আনবার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ওষুধগুলো তাঁর মায়ের হাতে দিয়ে বললেন:

সমীরবাবু : মা, এই নাও, বাবার ওষুধ। ঠিক সময় মতো খাইয়ে দিও। আমার আর সময় নেই। আমি চানে গেলাম।

মা ওষুধ নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। সমীরবাবু জামা-কাপড়, গামছা-তেল ইত্যাদি নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোলেন। দেখলেন বাথরুম বন্ধ।

সমীরবাবু : এ কী! বাথরুমে কে?

সুনন্দা : খোকা স্নানে গেছে।

সমীরবাবু (খুব রেগে) : আচ্ছা, তোমাদের কী কোনো বিচার-বিবেচনা নেই। জানো আমি এ সময় স্নানে ঢুকি। এই সময় খোকাকে স্নানে ঢুকতে হবে?

সুনন্দা : রোজ তো আগে আগে স্নান সেরে নেয়। আজ পরীক্ষা, পড়ছিল, তাই একটু দেরি হয়ে গেছে। তুমি একটু বসো, আমি না-হয় আর এক কাপ চা করে দিচ্ছি।

সমীরবাবু (ক্ষেপে গিয়ে) : চা? এখন স্নান করে ভাত খাব, না চা খাব? তোমার কী মাথা খারাপ হল? খোকা, তাড়াতাড়ি বেরোও, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

খোকা বেরিয়ে এল। সমীরবাবু অগ্নি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন;

সমীরবাবু : তোদের কী কোনোদিন বিবেচনা বোধ আসবে না? আমি তো একটা চাকরি করি। সেটা বুঝিস না?

সুনন্দা : আচ্ছা, এখন তো বাথরুম খালি হয়েছে। কথা না বাড়িয়ে যাও না চান করতে।

সমীরবাবু : তুমি চুপ করো। কথায় কথায় ফোড়ন কেটো না। দু'মিনিটে বেরিয়ে এসে বললেন।

সমীরবাবু : দাও, শিগ্‌গির খেতে দিয়ে দাও। একেবারে সময় নেই।

সুনন্দা খাবার টেবিলে খাবার দিলেন।

সমীরবাবু (খেতে খেতে) : ওহ!, মাছের ঝোলে কত ঝাল দিয়েছ। আহ্ কি গরম! মুখটা পুড়ে গেল। জানো এত তাড়াহুড়ো করে খাই, একটু ঠান্ডা করে দিত পারো না। না, এ মাছটা খাওয়া যাবে না। দাও একটু মাখন দাও, তাই দিয়ে খেয়ে নেব।

সুনন্দা একটা প্লেটে মাখন দিয়ে গেলেন আর একটা চামচ রেখে গেলেন।

সুনন্দা : রোজ এই একই ব্যাপার ঘটছে। কেন যে এত তাড়াহুড়ো করো?

সমীরবাবু : (চামচ দিয়ে মাখন তোলার চেষ্টা করতে করতে)- আঃ, একেবারে জমে পাথর হয়ে গেছে। (খুব বিরক্তির সঙ্গে) একটু আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রাখতে পারো না?

সুনন্দা (রেগে) : সব কিছুতে আমার দোষ! তুমি কেন সময়ে তৈরি হও না? খবরের কাগজ একটু কম সময় ধরে পড়লে কী হয়?

সমীরবাবু (বেশ রেগে) : একটা জিনিসে আমার সুখ, তাও তোমার সয় না? রইল তোমার খাওয়া।

সমীরবাবু ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়লেন।

সুনন্দা : এ কী! না খেয়ে উঠে গেলে যে! ভাতটুকু খেয়ে নাও। সারাদিন না খেয়ে থাকবে যে!

সমীরবাবু : থাক, আমার জন্য আর ভাবতে হবে না।

তৈরি হয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সমীরবাবু রাস্তায় বেরোলেন। ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

সমীরবাবু : ১০টা বেজে গেছে। ঠিক সময়ে অটো পেয়ে গেলে সময়েই পৌঁছে যাব। তাহলে আর হেডমাস্টারের কথা শুনতে হবে না।

সমীরবাবু রাস্তায় অটোর জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু একটাও অটো দেখা গেল না।

সমীরবাবু : একটাও অটো নেই, এ তো হয় না কখনও। লাইনও দেখি না। কী ব্যাপার? কোনো গন্ডগোল হয় নি তো?

একজন পথচারী : ও দাদা, অটোর জন্য দাঁড়িয়ে? দাঁড়াবেন না। ওরা স্ট্রাইক করেছে। পুলিশ নিয়ে কী একটা গন্ডগোল হয়েছে - সব লালবাজারে ধরণা দিতে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকবেন না, আজ আর অটো চলবে না।

পথচারী চলে গেলেন।

সমীরবাবু (খুব চিন্তিত আর উদ্‌বিগ্ন) : এখন কী করি? ১০/১৫-র মেট্রো তো আর ধরতে পারব না। (খুব উদ্‌বিগ্ন ভাবে) এই, রিক্সাওয়ালা, মেট্রো স্টেশন যাবে? কত নেবে? ২০ টাকা? এ কী মগের মুল্লুক পেয়েছ? অটো নেই বলে কি যা খুশি তাই করবে? কী বললে, না পোষালে যাবে না? তোমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না? যাচ্ছ কোথায়? চলো, চলো, যা চাইছে তাই দিতে হবে, গরজ যখন আমার।

১১টার সময় সমীরবাবু স্কুলের গেটের সামনে নামলেন। হন্ত-দন্ত হয়ে স্টাফ রুমের দিকে এগোলেন। নিশ্বাস দ্রুত ওঠা-নামা করছে। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোলেন। হাজিরার খাতায় সই করতে যেতেই হেডমাস্টারমশাই সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হেড্‌মাস্টার : সমীরবাবু, এই আপনার আসার সময় হল?

সমীরবাবু (আমতা আমতা করে) : হ্যাঁ স্যার, আজ একটু দেরি হয়ে গেল।

হেড্‌মাস্টার : আজ? কোন্ দিন আপনি সময়ে আসেন?

সমীরবাবু : স্যার, আজ আসলে অটো রিক্সার.......

হেডমাস্টার : (মাঝপথে থামিয়ে)-শুনুন শুনুন আজ অটো স্ট্রাইক, কাল রিক্সা ধর্মঘট, পরশু বাবার অসুখ কোনো না কোনো সমস্যা আমাদের থাকবেই, কিন্তু শিক্ষক হিসাবে একটা দায়িত্ব তো আছেই। একটু ছেলেমেয়েদের কথা তো ভাববেন? এইসব অজুহাত শুনতে রাজি নই। (বেশ কড়াভাবে) যান দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ক্লাসে যান, যেকটা মিনিট বাকি আছে সেকটা মিনিট অন্তত ছেলেমেয়েরা একটু পড়ুক।

সমীরবাবুর মুখটা লজ্জায় আর অপমানে কালো হয়ে গেছে। ক্লাসে ঢুকলেন। ছেলেরা প্রচন্ড চেঁচাচ্ছিল, সমীরবাবু ঢুকতে তারা চুপ করল। সমীরবাবু রোলকল শুরু করলেন। ছেলেরা 'উপস্থিত' 'উপস্থিত' করে উত্তর দিচ্ছিল। হঠাৎ ক্লাসের পেছন দিকে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল। সমীরবাবু মুখ তুলে দেখলেন পেছনের

বেঞ্চে বসে দু'টি ছেলে সামনে খাতা খুলে রেখে মাথা নীচু করে হাসছে। ওদেরই একজন মেঝেতে পড়ে যাওয়া পেনসিল তোলার জন্য বেঞ্চি থেকে ঝুঁকছে।

সমীরবাবু (প্রচন্ড রেগে) : এই, শিবু আর বীরু, কী হচ্ছে্টা কী? কী করছিস্। খাতা এদিকে আন।

শিবু আর বীরু মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল, উঠ্‌ল না।

সমীরবাবু (আরও রেগে এবং প্রচন্ড চিৎকার করে) : উঠে আয় বলছি। এখনও উঠলি না? উঠে আয়, নইলে আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

শিবু আর বীরু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খাতা হাতে উঠে এলো। সমীরবাবু খাতা খুলে দেখলেন ওরা কাটাকুটি খেলছিল।

সমীরবাবু : কাটাকুটি খেলা হচ্ছিল! এ ছাড়া আর করবিই বা কী? মাথায় তো গোবর পোরা। পড়াশোনার নাম-গন্ধ নেই, খালি বদ-মত্‌লব....(কান ধরলেন) আর কখনও করবি?

শিবু (ভয়ে ভয়ে) : না স্যার, আপনার আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই......

সমীরবাবু : আমার আসতে দেরি হচ্ছিল..... তো, বই খুলে পড়তে কী হয়েছিল? আবার মুখে মুখে কথা... সমীরবাবুর রাগ আর বাধা মানলো না।

সমীরবাবু : তবে রে, এতো আস্পর্ধা, দেখাচ্ছি তোকে।

সমীরবাবু বেত নিয়ে বেদম মারতে শুরু করলেন। খানিক পরে শিবু আর বীরু কাঁদতে কাঁদতে বেঞ্চিতে নিজের সিটে গিয়ে বসলো। সমীরবাবু ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে চোখ্ বন্ধ করে বসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে শিবু আর বীরুর কাছে গেলেন। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন :

সমীরবাবু : বড্ড্ লেগেছে, না রে? কাঁদিস্ না, বাবা। কী যে চন্ডাল রাগ আমার! কেন যে এতো রেগে যাই? আয় এদিকে আয়, সামনের বেঞ্চে বোস্। আর কোনদিন তোদের মারব না। আয় আমি ভালো করে তোদের ভূগোল বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সমীরবাবু শিবু আর বীরু-কে নিয়ে এসে সামনের বেঞ্চে বসিয়ে ধীরে ধীরে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগোলেন আর আস্তে আস্তে পড়াতে শুরু করলেন।

১.৩৯ অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য

দলের প্রত্যেকে কর্মশালা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দেবেন :

- যে উদ্দেশ্যে কর্মশালাটি আয়োজিত হয়েছিল সেটি কতদূর সফল হয়েছে?
- তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি - না?
- তাঁরা যা শিখেছেন, তার কোনো অংশ কর্মস্থলে প্রয়োগ করতে পারবেন কি না?
- আরও কী হলে ভালো হত?

অনুশীলনী

১.৮ অনুশীলনী - ১

আবেগ/অনুভূতি সংক্রান্ত পল একম্যানের ছবি

উপকরণ — পল একম্যানের ছবি, কাগজ, পেনসিল

১ ২ ৩



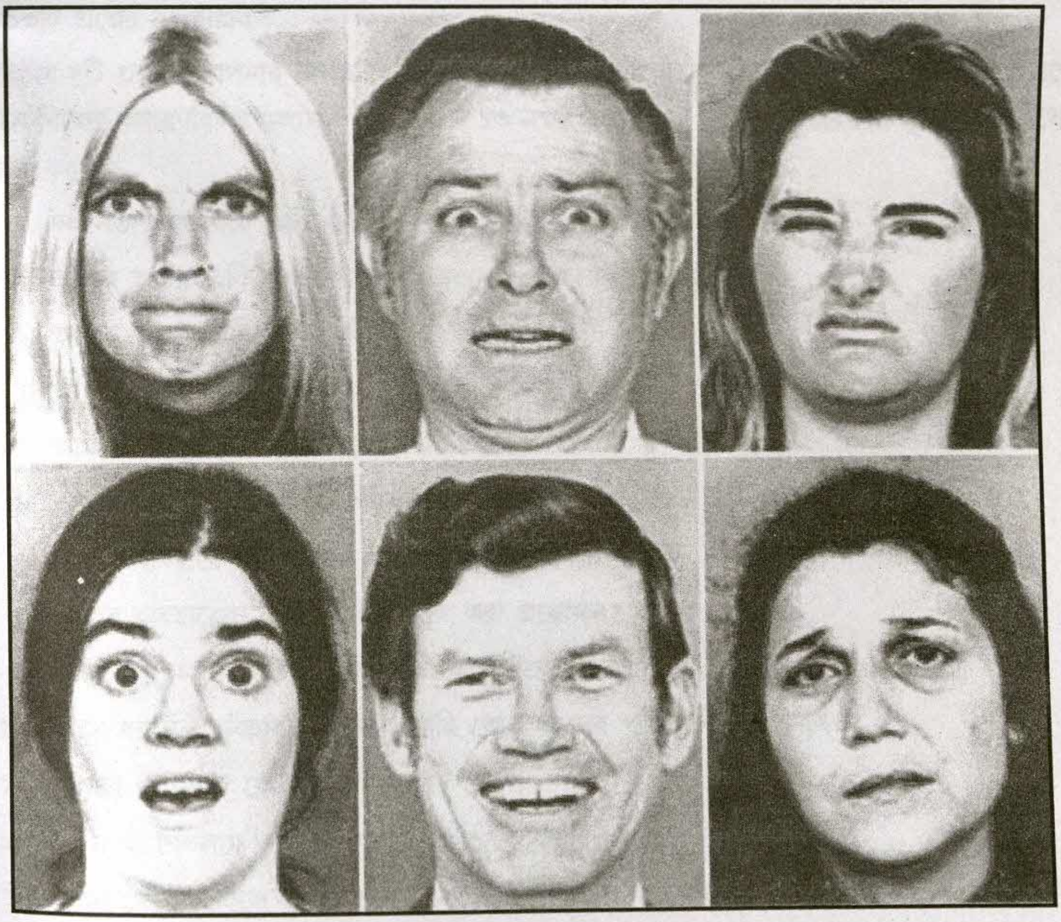
৪ ৫ ৬

১.৯ অনুশীলনী - ২

আবেগ/অনুভূতি সংক্রান্ত পল একম্যানের ছবি

উপকরণ — পল একম্যানের ছবি, কাগজ, পেনসিল

১ ২ ৩



৪ ৫ ৬

বাঁ দিক থেকে শুরু করে কোন্ ছবিতে কী অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, চিনতে চেষ্টা করুন।

১.১১ অনুশীলনী - ৩

আমার জীবনের পাঁচটি আঙুল



১.১৩ অনুশীলনী - ৪

রোয়েস্‌লারের প্রশ্নাবলি

দলনেতা হিসেবে শিক্ষকের নিজের আচরণগুলো বিশেষভাবে অনুশীলন করা
— (Roesler questionnaire)

১৩টি প্রশ্নের ব্যবহারবিধি :

প্রথম দুটি প্রশ্নকে আপনার নিজস্ব 'আচরণবিধি' পুনর্বিবেচনার জন্যে ব্যবহার করুন। ৩ - ৮ নম্বর প্রশ্নের মাধ্যমে নিজের আচরণবিধির মূল্যায়ন করুন। ৯ - ১৩ নম্বর প্রশ্নগুলিকে নিম্নের মূল্যায়নের পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করুন।

১. দলনেতার ভূমিকায় আমি দলভুক্ত লোকেদের সাথে কেমন ব্যবহার করি?

২. আমার আচরণবিধি দলের উপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে?

৩. আমার আচরণবিধি কি সাবলীল?

৪. আমার ব্যবহার কি যথাযথ?

৫. আমার কি কোনো 'ভুল' আচরণবিধি আছে?

৬. আমার ব্যবহার কি আমার পরিবর্তন করার দরকার আছে?

৭. আমার ব্যবহারে কী ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার?

৮. আমার ব্যবহারের মধ্যে কী পরিত্যাগ করা প্রয়োজন?

৯. পরিত্যাজ্য আচরণগুলো আমি কীভাবে পরিত্যাগ করব?

১০. নতুন ধরনের ব্যবহারবিধি নিয়ে আমি কোন্ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করব?

১১. আমায় এ কাজে কে সাহায্য করবে?

১২. আমি যা শিখলাম তা আমার মধ্যে কীভাবে বজায় করব?

১৩. এখন থেকে তাহলে আমি যাদের নেতৃত্ব দিই, তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করব?

১.১৬ অনুশীলনী - ৫

নিজের অনুভূতিকে চেনা

অনুভূতি - উদ্রেক করা প্রশ্নাবলি :

১. হেডমাস্টারমশাই বললেন আমরা নাকি যত্নশীল শিক্ষক নই, তাই স্কুলের মান পড়ে যাচ্ছে।

২. আতঙ্কবাদ সামাজিক উৎসবের মনটাকেই মেরে ফেলবে।

৩. এবার পৌষমেলায় শান্তিনিকেতন যাব ভাবছি।

৪. কিছু ছাত্রের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব আমাদের অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

বাক্য সম্পূর্ণ করা :

নিম্নলিখিত বাক্যগুলো 'মনে প্রথম উঠে আসা' শব্দ নিয়ে পূর্ণ করুন।

১. আমি সবচেয়ে সুখী হই, যখন ....

২. আমার মন বিষণ্ণ হয়, যখন ....

৩. আমি ভাবি, যদি আমি ....

৪. আমি বিশ্বাস করি ....

৫. আমার ব্যথা লাগে, যখন ....

৬. আমি রেগে যাই, যখন ....

৭. আমি তৃপ্তবোধ করি, যখন ....

৮. আমার নিজেকে তখনই সর্বাধিক স্নেহের পাত্র মনে হয়, যখন ....

১.১৯ অনুশীলনী - ৬

সহমর্মিতার প্রতিক্রিয়া

সহমর্মিতার ক্ষমতার বিচার সম্পর্কে প্রশ্নাবলি :

১. স্কুলের চাপে আমার নাজেহাল অবস্থা

▼ খুব চাপের মধ্যে আছ বোঝা যাচ্ছে, একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছ।

▼ তোমার কিছু কাজ নতুন শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও।

▼ মাঝে মাঝে ছুটি নিলে পারো তো?

▼ তোমাদের পাশের স্কুলে কিন্তু খেলাধুলার প্রভাবটা বেশি।

▼ আশা করি তুমি বিশ্রামের জন্যে লম্বা ছুটি নেবে।

▼ আমি হলে এত চাপ নিতামই না।

২. ছেলেমেয়েরা বাড়িতে সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে কথা বলছে।

▼ ওরা বুঝতে পারে না তুমি কত কষ্ট করে উপার্জন করো।

▼ ওদের হাতখরচের পয়সা কমিয়ে দাও।

▼ তুমি তো ওদের নিয়ে বসে একটু গান করতে পারো।

▼ তুমি ওদের উপর সারাক্ষণ রেগে থাকো না তো?

▼ শত জিদ করলেও আমি ছেলেমেয়েদের মোবাইল দিতে নারাজ।

৩. কাল রাতে আমার একটুও ঘুম হয়নি।

▼ আজ কি খুব ক্লান্ত লাগছে?

▼ শুধু শুধু শুয়ে না থেকে নিজের কিছু কাজ করে ফেললেই পারতে?

▼ কাল মাঝরাতে একটা ভালো সিনেমা হচ্ছিল টেলিভিশনে।

▼ আশা করি সকালেও তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়োনি?

▼ আমি হলে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিতাম।

৪. মায়ের শরীরটা তেমন ভালো নয়, একা রেখে কী করে যে দিল্লি গিয়ে কাজটা করব?

▼ বিষয়টা খুবই চিন্তার।

▼ বয়স হলে মা-বাবার শরীর খারাপ হয়ই, তাই বলে কাজ ফেলে রাখা যায় নাকি?

▼ মাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছ না নিশ্চয়ই।

▼ একটা লোক মাকে দেখাশোনার জন্যে রেখে দিলেই তো হয়।

▼ একটা ভালো exhibition হচ্ছে, চলো একদিন দেখে আসি।

১.২০ অনুশীলনী - ৭

সহমর্মিতার প্রশ্নাবলি

বক্তব্য : কোন্‌টির সঙ্গে আপনি সহমর্মিতা করতে পারেন, আর কোন্‌টির সঙ্গে পারেন না?

১. আমি ঘুষ নেওয়া অন্যায় বলে মনে করি না। পৃথিবী তো ঘুষের জোরেই চলছে।

২. ক্লাসে মোবাইল আনলে এমন কী দোষ।

৩. ছাত্রছাত্রীদের নিগ্রহ এমন কিছু নিন্দনীয় নয়।

৪. এত পড়ার চাপ থাকলে সবকিছু পড়া সম্ভব নয়। একটু টোকাটুকি কোনো ব্যাপার না।

৫. আমার যাকে ভালো লাগে, তাকে আমার চাই-ই। আমি দেখি, ও অন্য কাউকে কী করে ভালোবাসে।

উত্তরের শেষে আলোচনা।

১.২৩ অনুশীলনী - ৮

অ-ভাষাগত সংযোগস্থাপন

দুজনের ছোটো ছোটো দল গঠন করা হল। দলের দুজন পরস্পরের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসবেন এবং তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলবেন। প্রথম জনের কথা বলা শেষ হলে দ্বিতীয় জন কথা বলবেন।

দুজনেই পরে কথা বলার সময় নিজের অনুভূতি লিখে রাখবেন।

পরে ছোটো দলগুলি আবার বড়ো দলে ফিরে আসবেন এবং নিজেদের অনুভূতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

সংযোগস্থাপনের ক্ষেত্রে অ-ভাষাগত প্রকাশ, শ্রোতার অভিব্যক্তি ইত্যাদি যে কত গুরুত্বপূর্ণ—সেটা বোঝানো এই অনুশীলনীর উদ্দেশ্য।

১.২৫ অনুশীলনী - ৯

সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা

সক্রিয়ভাবে শোনা—

উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, মার্কার

পদ্ধতি :

- ▼ দলটিকে ছোটো ছোটো দল বা উপদলে ভাগ করে দিন।
- ▼ উপস্থাপক প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট একটি বিষয় দেবেন যে বিষয় নিয়ে দলের প্রত্যেকে আলোচনা করবে এবং নিজের মতামত জানাবে।
- ▼ দলের প্রথম বক্তা বিষয়টি নিয়ে যা মনে আসে বলতে পারেন কিন্তু পরের বক্তা তখনই কিছু বলতে পারবেন যখন তিনি পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্যের সারাংশ ঠিক ঠিকভাবে বিধৃত করেছেন। তিনিও বক্তব্য রাখবেন।
- ▼ সময় শেষে সকলে বড়ো দলে ফিরে আসবেন।

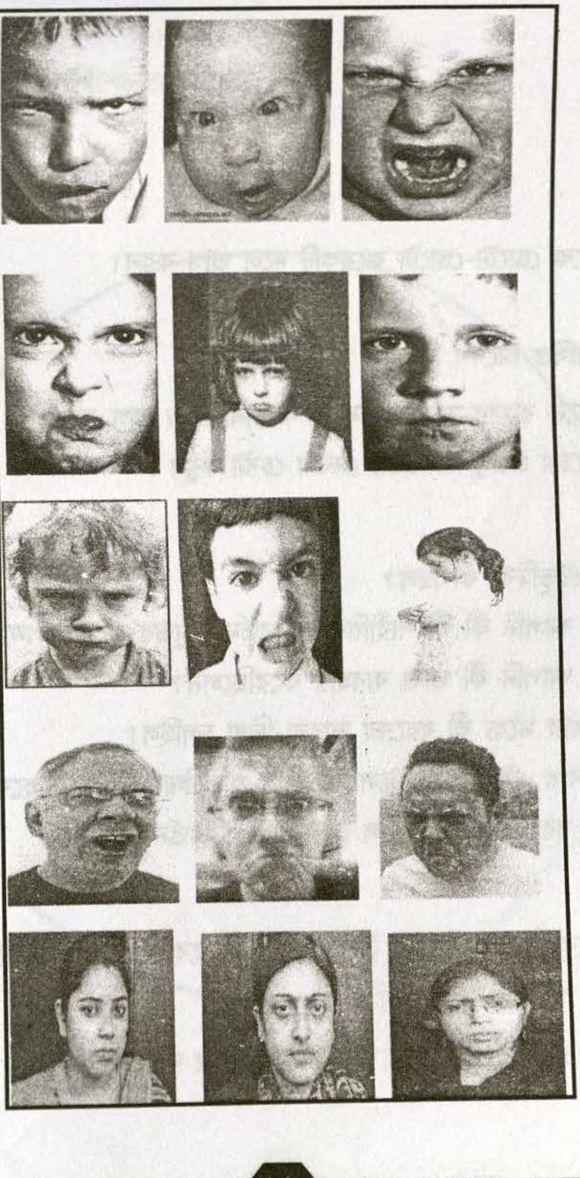
আলোচনা মূলত নীচের তিনটি সূত্র ধরে —

- ▼ অনুশীলনীতে অংশগ্রহণ করে কেমন লাগল?
- ▼ কী ধরনের অনুভূতি মনে জাগছিল?
- ▼ কর্মস্থলে এই অভিজ্ঞতার কোনো অংশ কি কাজে লাগবে?

১.২৮ অনুশীলনী - ১০

রাগের অভিব্যক্তি চিহ্নিতকরণ

উদ্দেশ্য : রাগের অভিব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং নিজের ক্রোধের সম্ভাব্য অভিব্যক্তির বর্ণনা।



১.২৯ অনুশীলনী - ১১

রাগের অভিব্যক্তি চেনা ও নিয়ন্ত্রণ

উপকরণ :

ব্ল্যাকবোর্ড

চক

ডাস্টার

চার্ট পেপার

নির্দেশ :

১. বড়ো দলটিকে ছোটো-ছোটো কয়েকটি দলে ভাগ করুন।

২. তাদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দিন :

বিদ্যালয়ে মনে রাখার মতো শেষবার আপনার যে রাগ হয়েছিল সেটা মনে করুন এবং সেই প্রেক্ষিতে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করুন :

- রাগের পটভূমিকা কী ছিল?
- সেসময়ে আপনি কী কী শারীরিক পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন?
- সেসময়ে আপনি কী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন?
- তখন মাথার মধ্যে কী ধরণের ভাবনা-চিন্তা চলছিল?
- আর একবার এই ঘটনা ঘটলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী একই হবে, নাকি অন্য ধরনের হবে?
- যদি অন্য ধরনের হয়, তাহলে কেন এই পরিবর্তন?

৩. দলের প্রত্যেকে নিজের নিজের উত্তর আলাদা ভাবে লিখবেন। লেখা শেষ হয়ে যাবার পর তারা নিজের মধ্যে আলোচনা করবেন।

৪. অনুশীলনী শেষ হবার পর সবাই বড়ো দলে ফিরে আসবেন।

১.৩২ অনুশীলনী - ১২

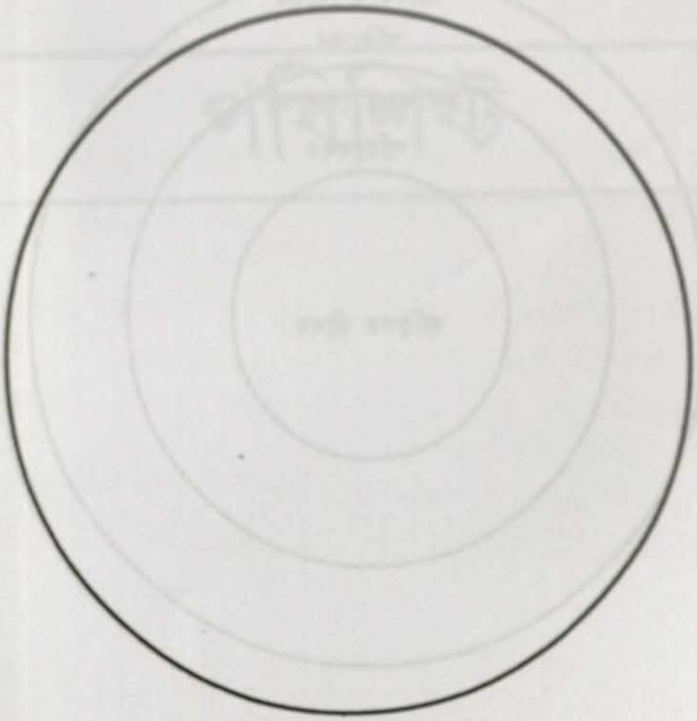
মানসিক চাপ ও ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন

মানসিক চাপের উৎস নির্ণয়— ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য—

(১) মানসিক চাপের উৎস নির্ণয়।

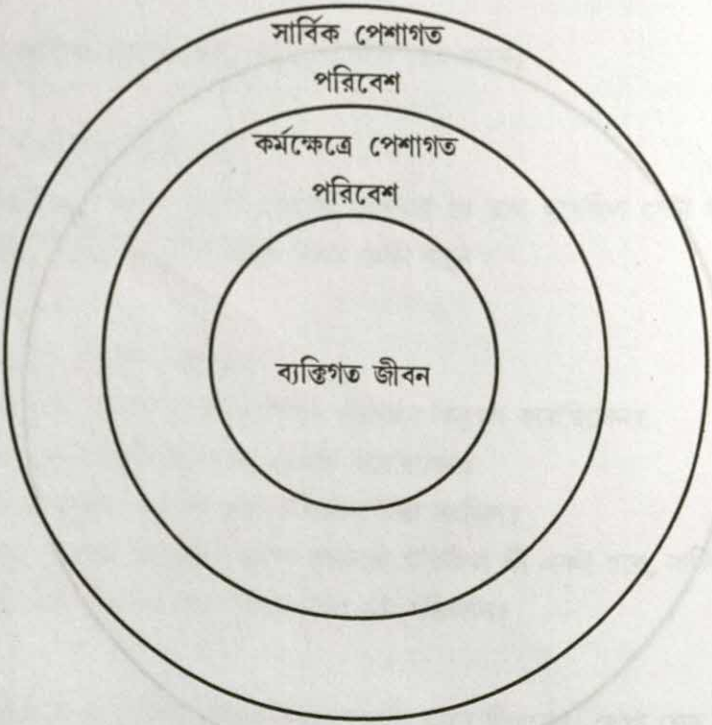
(২) তার বিশ্লেষণ ও পুনর্বিবেচনার শিখন।



১.৩৪ অনুশীলনী - ১৩

ব্যক্তিগত, কর্মক্ষেত্রে ও সার্বিক পেশাগত জীবনের চাপ নির্ধারণ

উদ্দেশ্য—(ক) ব্যক্তিগত জীবন খ) কর্মক্ষেত্রের পেশাগত পরিবেশ ও (গ) সার্বিক পেশাগত পরিবেশের চাপ নির্ণায়ণ।



পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১

১. বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি আমাদের মনন-চিন্তনের দিকটি পরিমাপ করে। এই বুদ্ধির পরিমাপ আই. কিউ.(IQ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

২. মনন-চিন্তন ছাড়াও আবেগ-অনুভূতির দিকও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮০ সালের পর ক্রমশ এ সম্বন্ধে গবেষণা হতে শুরু করে।

❒ আবেগ-অনুভূতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

মনন-চিন্তন এবং আবেগ-অনুভূতি পুরোপুরি পৃথক নয়। একটির সঙ্গে অপরটির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই যোগসূত্র খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিম্নলিখিত ধরনের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে :

- জটিল সিদ্ধান্ত নেওয়া
- আত্মসচেতনতা
- নিজের অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা
- প্রেষণা
- সহমর্মিতা ও
- আন্তরব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ

পরিশিষ্ট - ২

❒ আত্মসচেতনতার প্রয়োজন কী?

✤ নিজের অনুভূতির সম্বন্ধে সচেতন হলে, তবেই অন্যের অনুভূতি বোঝা সম্ভব।

✤ সহমর্মিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্ শর্ত।

✤ নিজের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করারও প্রাক্-শর্ত হচ্ছে আত্মসচেতনতা।

❒ আত্মসচেতনতা বলতে কী বোঝায়?

✤ তোমার কী ধরনের অনুভূতি হচ্ছে তুমি তা বুঝতে পারছ এবং সেই অনুভূতির নামও তুমি জানো।

✤ তোমার মানসিক অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ।

✤ তুমি নিজের অনুভূতির জগৎ সম্বন্ধে এই জ্ঞান নিজের ও অন্যের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারছ।

✤ অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হবার সাথে সাথে তার সঙ্গে যুক্ত চিন্তাভাবনা সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে।

পরিশিষ্ট - ৩

❒ নিজের অনুভূতি অন্যের কাছে জানাতে সাধারণত কী ধরনের ভুল হয় ঃ

- ✤ প্রকৃত অনুভূতি গোপন করা।
- ✤ ভাব ও ভাষায় বিরোধিতা।
- ✤ কোনো বিশেষ অভিব্যক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার।
- ✤ অতিশয়োক্তি।
- ✤ লঘুকরণ (Minimization)।
- ✤ অপ্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপন।

পরিশিষ্ট - ৪

সহমর্মিতা

সংজ্ঞা : সহমর্মিতার অর্থ হল একটি মানুষকে এত ভালোভাবে বুঝতে পারা যে আপনি তার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যান, তার মতো করে পরিস্থিতিকে দেখতে পারেন এবং তার মতো করে অনুভব করেন। আপনি যেন তার জুতো পায়ে দিয়ে মাইলখানেক পথ হেঁটে এলেন।

❐ সহমর্মিতা ও সহানুভূতির মধ্যে পার্থক্য :

❖ সহমর্মিতায় আমরা ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে ওই বিশেষ সময়টুকু একাত্ম বোধ করি, তার মতো অনুভব করি। তারপরে আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি এবং নিজের অবস্থান থেকে তাকে সাহায্য করতে বা ওই বিশেষ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারি (feeling into)।

❖ সহানুভূতির ক্ষেত্রে আমরা ওই ব্যক্তি-বিশেষের অনুভূতি নিজেরাও অনুভব করি এবং তার সাথে অনুভব করতে থাকি (feeling with)। সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে। আমরা অন্যের অবস্থান বুঝে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো।

পরিশিষ্ট - ৫

❒ কী কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সহমর্মীভাবের বিরোধিতা করে?

✤ বিষয়ের পরিবর্তন করে দেওয়া।

✤ তোমার থেকে আমি বেশি জানি গোছের প্রতিক্রিয়া।

✤ বিচারক বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মন্তব্য করা বা দেখা।

✤ উপদেশ দেওয়ার মনোভাব।

পরিশিষ্ট - ৬

❒ সংযোগস্থাপনের বিভিন্ন স্তর :

- ✤ গতানুগতিক / সৌজন্যমূলক **(Cliche)**
- ✤ তথ্যসংক্রান্ত **(factual)**
- ✤ বোধবুদ্ধি, উপলব্ধি সংক্রান্ত **(intellectual)**
- ✤ আবেগ অনুভূতি সম্পর্কিত **(Emotional)**

কিছু উদাহরণ যা সংযোগস্থাপনে নানারকম গন্ডগোল, বিভ্রান্তি, ঝগড়া তৈরি করে —

১. মাঝপথে বাধা দেওয়া **(Interruption)**
২. সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা **(Establishing the truth)**
৩. একসঙ্গে অনেকগুলো সমস্যার উল্লেখ করা **(Dealing with multifaceted problem)**
৪. 'সবসময়' বা 'কখনও না' এরকম শব্দের ব্যবহার করা **(Using extreme statements like 'always' and 'never')**
৫. খারাপ বলে ছাপ মেরে দেওয়া **(Using trait names)**
৬. আন্দাজ করে নেওয়া বা অনুমান করা **((Guessing)**
৭. অন্যজন কী ভাবছে তা অনুমান করে নেওয়া **(Mind reading)**
৮. দোষ দেওয়া **(Blaming)**
৯. মুখের ভাষা ও হাবভাবের মধ্যে অসংগতি **(Difference between verbal language and nonverbal language)**
১০.উচিত-অনুচিত বা ভুল-ঠিক— বলা **(Judgemental statement)**

সক্রিয়ভাবে শোনা :

সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা

'আমি' শব্দের ব্যবহার

পরিশিষ্ট - ৭

❒ রাগ বা ক্রোধ :

- রাগ একটি আবেগ।
- আমাদের ইচ্ছাপূর্তির পথে যেখানে বাধার সৃষ্টি হয়, সেখানে যে বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি বাধার সৃষ্টি করেছে, তার প্রতি আমাদের রাগ হয়।
- রাগের ক্ষেত্রে রাগের বিষয় থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা হয় এবং তাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা হয়।

❒ রাগের অভিব্যক্তি :

- দৈহিক
- ব্যাবহারিক বা আচরণগত
- আবেগগত
- চিন্তাগত

❒ রাগের প্রশমন :

- কিছুক্ষণের জন্য সে স্থান থেকে সরে যাওয়া।
- অন্য কারও সাথে কথা বলা।
- অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলা।
- রাগের লক্ষণ চিনে নিয়ে, সেই বক্তব্য না-রেগে বলা।
- ক্রোধ দমনের অস্বস্তি ভেতরে নিয়েও চলতে শেখা।
- রাগের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধিত করতে চাইছি, পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কিনা।
- যে ধারণার জন্য রাগ হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে বাস্তবের সঙ্গে ধারণাটির মিল আছে কিনা, খতিয়ে দেখা।
- গভীর নিশ্বাস নেওয়া।
- শান্তিদায়ক দৃশ্য কল্পনা করা।
- নিজের চিন্তা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা।
- যুক্তি দিয়ে আবেগকে সংযত করা।

পরিশিষ্ট - ৮

❑ আগ্রাসনমূলক মনোভাব

- অন্যকে আঘাত করে
- লোকে ভয়ে মান্য করে

❑ অপ্রতিরোধী মনোভাব

- নিজের মূল্যে অন্যকে মান্য করে
- আত্মসম্মানবোধ কমে যায়
- অন্যের কথা মুখ বুজে মেনে চলে

❑ আত্মপ্রত্যয়মূলক (assertive) মনোভাব

- নিজের অনুভূতি, আবেগ, মতামত ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা।
- অন্যের অধিকার খর্ব করে না।
- অন্যের সম্মানবোধে আঘাত দেয় না।

পরিশিষ্ট - ৯

মানসিক চাপ বা স্ট্রেস (Stress)

সংজ্ঞা : যখন কোনো পরিস্থিতি বা বহির্জগতের দাবি ব্যক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখনই মানুষটি মানসিক চাপ অনুভব করেন।

❒ স্ট্রেসের প্রকার :

তিনধরনের স্ট্রেস বা চাপ সম্বন্ধে আমরা কথা বলতে পারি—

(১) *প্রাত্যহিক স্ট্রেস* —

- সকলের হয়
- দৈনন্দিন জীবনের অংশ
- আমাদের প্রেষণা বাড়ায়
- বিশেষ চিন্তা ছাড়াই আমরা এগুলো নিয়ন্ত্রিত করতে পারি

(২) *পুঞ্জীভূত (cumulative) স্ট্রেস* —

- দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত বিভিন্ন ধরনের **stressor**-এর সম্মুখীন হওয়া এবং তার অপ্রকাশিত প্রতিক্রিয়ার ফল
- ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত ব্যর্থতামূলক উপাদানের সমষ্টি
- যদি চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণে না আনা হয়, তাহলে **burn out**-এর দিকে যেতে পারে।

(৩) *চরম সংকটপূর্ণ ঘটনার স্ট্রেস (critical incident stress)* —

- অসাধারণ ঘটনার প্রতিক্রিয়া যা প্রায় সকলের মধ্যেই অত্যন্ত বড়ো ধরনের স্ট্রেস সৃষ্টি করে;
- আকস্মিক এবং জীবনের স্বাভাবিক ধারায় বাধা সৃষ্টি করে
- প্রকৃত অথবা কাল্পনিক ভয় বা ক্ষতির আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে
- অসহায়ত্ববোধের সৃষ্টি করে।
- জগৎ ও জীবন থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর বোধ সৃষ্টি করে। বহির্জগৎ যেন আর নিরাপদ বলে মনে হয় না।

❒ কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরি :

- যে ঘটনা বা পরিস্থিতি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় Stress। ঘটনাটি সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া হল — Stress।

- দুই ব্যক্তির একই ঘটনায় মানসিক চাপ ভিন্ন রকমের হতে পারে অর্থাৎ তাদের Stress আলাদা।
- যে বিষয় নিয়ে আমরা মানসিক চাপ অনুভব করি, তা আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে।
- সাধারণত নঞর্থক আবেগের সঙ্গে যুক্ত।
- ক্ষমতার তুলনায় বেশি বা অল্প কাজ, উৎকণ্ঠা, রাগ, গতানুগতিক জীবনধারা, হীনম্মন্যতা বোধ ও বিষণ্ণতা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে।
- স্ট্রেস জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ। কিছু পরিমাণ স্ট্রেস আমাদের কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতা বাড়াবার জন্য জরুরি। তাই স্ট্রেসকে জীবন থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় না। আমরা শুধু স্ট্রেস কমানোর এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে পারি।

চাপের অনুভব কমানো —

এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের গুরুত্ব রয়েছে —

- বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা
- আমাদের ধ্যানধারণা
- মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা
- সমস্যা-সমাধানের দক্ষতা
- চাপের উৎসগুলো চেনা

অন্যান্য পদ্ধতি :

- সময়ের যথাযথ ব্যবহার
- আবেগ ও অনুভূতির যথাযথ প্রকাশ
- সদর্থক চিন্তাধারা
- আত্মনিয়ন্ত্রণ
- সদর্থকভাবে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা
- বন্ধুত্বের পণ্য তৈরি করা
- স্বাস্থ্য ভালো রাখা
- নিয়মিত ব্যায়াম করা
- আত্মধ্বংসী চিন্তা পরিত্যাগ করা
- নিজের শক্তি ও দুর্বলতা চিনে রাখা
- জীবনদর্শন বা জীবনবোধ গড়ে তোলা

পরিশিষ্ট - ১০

আবেগজনিত সমস্যা মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) উদ্‌বেগ সংক্রান্ত সমস্যা

(২) মানসিক সমস্যাজনিত শারীরিক উপসর্গ

(৩) বিষণ্ণতা-অসুখ ও আত্মহত্যা

আমরা এখানে শুধু উদ্‌বেগ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েই আলোচনা করব।

উদ্‌বেগ সংক্রান্ত সমস্যা :

শারীরিক লক্ষণ —

- হাত-পা কাঁপা
- ঝাঁকুনি
- আচমকা পেশিতে টান
- মাথা ব্যথা
- পিঠে যন্ত্রণা
- শ্বাস নিতে কষ্ট
- শ্বাস-প্রশ্বাসের লয় দ্রুত হওয়া
- তোতলামি
- গলায় কিছু আটকে থাকার অনুভূতি
- মুখের রং ফ্যাকাশে বা লাল হয়ে যাওয়া
- কান গরম হওয়া
- বুক ধড়ফড় করা
- হাত-পা ঘেমে ঠান্ডা হয়ে আসা
- ডায়ারিয়া বা পেটে অস্বস্তিবোধ
- বমি-বমি ভাব/বমি পাওয়া
- ঘন-ঘন প্রস্রাব পাওয়া

মানসিক লক্ষণ —

- ভয় ও আতঙ্কের অনুভূতি
- কোনো কিছুতে মনোযোগ না দিতে পারা
- অস্থিরতা, বিরক্তি ও অস্বস্তিকর অনুভূতি
- অতিরিক্ত সতর্কতা

* হঠাৎ ডাকলে চমকে ওঠা
* ঘুম না হওয়া
* নিরাপত্তাবোধের অভাব
* আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারা
* নিজেকে অসহায় ভাবা ইত্যাদি।

Panic attack হল উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার চরম প্রকাশ।

অবসেশন : একরকম চিন্তা যা আক্রান্ত ছেলে বা মেয়ের মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার-বার মনে আসে। অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক, বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক মনে হলেও সে ওই চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিতে পারে না।

কমপালশন : অবসেশনের প্রতিফলনযুক্ত আচরণ। একটা কাজ যা আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে বারে বারে বাধ্যতামূলকভাবে করে যেতে হয় (যেমন, বার-বার ধোয়া, মোছা, ছোঁয়া বা গোনা)। মনে হয়, কাজটি না করলে তার কোনো বিপদ হয়ে যাবে।

ফোবিয়া : *নির্দিষ্ট ফোবিয়া —*

বিশেষ কোনো জীব-জন্তু, কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক ঘটনা (যেমন ঝড় বা বৃষ্টি), বিশেষ কোনো স্থান বা পরিস্থিতি, বিশেষ কোনো রোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অস্বাভাবিক ভীতি।

সোশ্যাল ফোবিয়া —

সাধারণত সামাজিক মেলামেশা, অনুষ্ঠান, সম্মিলনী প্রভৃতিকে ভয় এবং বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায়।

অ্যাগোরাফোবিয়া —

বিশেষ কোনো পরিস্থিতি / যানবাহনে বা স্থানে কখনো-কখনো তীব্র উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দেয়, যে যে স্থান বা যানবাহন থেকে দ্রুত 'নিরাপদ স্থানে' (সাধারণত বাড়িতে) ফিরে আসা কঠিন।

পরিশিষ্ট - ১১

❐ আচরণজনিত সমস্যা :

তিনটি :

(a) Attention Deficit Hyperactivity Disorder বা ADHD

(b) Conduct Disorder

(c) Oppositional Defiant Disorder.

(a) ADHD

- মনোযোগ দেবার অক্ষমতা।
- শুধু পড়াশোনায় নয়, কাজে কর্মে, খেলাধুলায় সব কিছুতেই বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- অনেক সময় **hyperactivity** যুক্ত হয়ে থাকে, তার ফলে
  - ⇛ অতিরিক্ত দুরন্তপনা করে
  - ⇛ হঠকারী কাজকর্ম করে ফেলে
  - ⇛ দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে
  - ⇛ অনেক সময় আক্রমণাত্মক ও অপরাধপ্রবণ আচরণের সমস্যাযুক্ত থাকে

(b) Conduct Disorder :

- একধরনের ধারাবাহিক আচরণের সমস্যা যা অন্যের ক্ষতি করে সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে। শিশু ও কিশোর অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে এই **Conduct Disorder** বহুক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন থাকে। সাধারণত এদের আচরণ হয় ঃ
  - ⇛ আক্রমণাত্মক—যা অন্য ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি করে
  - ⇛ ধ্বংসাত্মক
  - ⇛ চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা
  - ⇛ গুরুতর আইনশৃঙ্খলা ভাঙা

(c) Oppositional Defiant Disorder : ODD

- ধারাবাহিকভাবে পিতা-মাতা, গুরুজন ও কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তির বিরোধিতা করা—এটি **Conduct Disorder**-এরই আর একটি দিক।

সাধারণত নিম্নলিখিত আচরণের মাধ্যমে সমস্যাটি প্রকাশ পায় :

⇛ বড়োদের সঙ্গে তর্ক করা

⇛ সব কিছুতেই বিরোধিতা করা

⇛ একটুতেই মেজাজ হারানো

⇛ প্রচলিত নিয়ম না-মানা

⇛ বড়োদের অনুরোধ না-মানা

⇛ অস্বাভাবিক জেদ এবং রাগ

⇛ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের জ্বালাতন করা

⇛ নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া

⇛ অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা—একটুতেই বিরক্ত বা অপমানিত বোধ করা

⇛ প্রায়ই আক্রোশপূর্ণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ করা

এই ধরনের আচরণগুলি এদের মধ্যে

▲ খুব ঘন-ঘন দেখা যায়।

▲ আচরণগুলি বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক।

পরিশিষ্ট - ১২

শাস্তি সম্পর্কে কিছু কথা

দৃশ্য - এক দীপক ক্লাস নাইনের ছাত্র। স্কুলে যাবার নাম করে সে বাড়ি থেকে বেরোয় কিন্তু না গিয়ে প্রায়ই নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। স্কুল ছুটির সময় পেরোলে সে বাড়ি ফেরে।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর একদিন বাংলার মাস্টারমশাই গৌরবাবু দীপককে ক্লাস থেকে ডেকে স্টাফ রুমে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পেটালেন। দীপকের পিঠে বেতের অনেকগুলি কালশিটে দাগ ঘটনার দিন সাতেক পরেও থেকে গেছে।

দৃশ্য - দুই সুরেনবাবুর ক্লাসে পড়া না পারলে ছাত্রদের কপালে সাধারণত কিলচড় তো থাকেই, তার সঙ্গে থাকে অসুস্থ না হয়ে পড়া পর্যন্ত উঠবোস। তেরো বছর বয়সের সমীরের ভাগ্যে জুটে ছিল শ'তিনেক উঠবোস। শ'খানেক উঠবোস করার পরে তার আর দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না। বেশ কয়েকদিন স্কুলেই আসতে পারেনি সেই ঘটনার জেরে।

দৃশ্য - তিন নার্সারি স্কুলের এক খুদে পড়ুয়া পড়া না পারায় বেদম মার খেল শিক্ষিকার হাতে। শুধু তাই নয়, সেই শিক্ষিকার ক্রোধ এতই তীব্র যে, পাঁচ বছরের ছাত্রীর চুলের ঝুঁটি ধরে তিনি এমনভাবে ঝাঁকালেন, যাতে তার মাথার বেশ কিছুটা চুল চলে এলো দিদিমণির হাতে।

দৃশ্য - চার রমেশ বন্ধুর বই চুরি করেছিল এটা জানার পর ক্লাস টিচার অমলবাবু তাকে সারাদিন নীলডাউন হয়ে ক্লাস ঘরের সামনে বসে থাকার শাস্তি দিয়েছিলেন।

দৃশ্য - পাঁচ গীতা অঙ্কে খুবই কম নম্বর পেয়েছিল। রেজাল্ট পাবার পর সে অঙ্কের ঘরে কারচুপি করে নম্বর বাড়িয়ে নিয়েছিল।

রেজাল্ট জমা দেওয়ার সময় তার এই কারচুপি ধরা পড়ে যায়। ক্লাস নাইনের এই ছাত্রীটিকে কান ধরে স্কুলের প্রতিটি ক্লাসে ঘোরানো হয়েছিল।

খবরের কাগজে প্রকাশিত কিংবা খুব কাছ থেকে দেখা ছাত্রছাত্রীর কথা বলা হয়েছে এখানে, যারা নানান কারণে শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছে শাস্তি পেয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে শাস্তি দেওয়ার পিছনে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যটি হল ছাত্রছাত্রীদের সংশোধন করা, অর্থাৎ যাতে তারা শাস্তি পাবার পর ঠিকমতো মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারে কিংবা অশিষ্ট আচরণ বন্ধ করে শৃঙ্খলাপরায়ণ আচরণ করতে শুরু করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে শাস্তিপ্রাপ্ত এই ছাত্রছাত্রীদের পরিণতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো সংবাদ আমরা পাইনি। খবরের কাগজও নিশ্চুপ। আমরা জানতে পারলাম না তারা কতটা সংশোধিত হয়েছে। অর্থাৎ কতটা তারা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে উঠেছে, কিংবা কতটাই বা শৃঙ্খলাপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

সাধারণ বোধের জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা যায়, দু একটি ব্যতিক্রম বাদে এই জাতীয় শাস্তিবিধান প্রায় সবক্ষেত্রেই অকার্যকারী থেকে যায়।

মনোবিজ্ঞানে সমস্যাগ্রস্ত আচরণের সংশোধনে একাধিক কার্যকর উপায়ের মধ্যে শাস্তিদানও অন্যতম এক উপায়। তবে শাস্তিরও নানান রকমফের রয়েছে। কিন্তু, এখানে আমরা যে ক'টি শাস্তিবিধান দেখলাম, সেগুলি মূলত শারীরিক শাস্তিদানই। শারীরিক শাস্তি সম্পর্কে আমাদের কিছু প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নগুলি আমাদের পরবর্তী আলোচনাকে সাহায্য করবে।

- ❑ শাস্তি যাকে দিচ্ছেন, আপনি কি নিশ্চিত যে সে-ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে? অর্থাৎ রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে চাপছে না তো?
- ❑ শাস্তি যাকে দিচ্ছেন, সে সত্যিই শাস্তি পাবার মতো অপরাধ করেছে তো?
- ❑ আপনি শাস্তি যে কারণে দিচ্ছেন, তা আপনার নিজের ক্ষেত্রে ঘটলে কতটা শাস্তিযোগ্য হত বলে মনে করেন আপনি?
- ❑ যেভাবে আপনি শাস্তি দিচ্ছেন, সেভাবে শাস্তি দিলে ছাত্র বা ছাত্রীটিকে কতটা সংশোধন করা যাবে—সে সম্পর্কে আপনি কতখানি নিশ্চিত।
- ❑ কীভাবে শাস্তি দিচ্ছেন, কতটা শাস্তি দিচ্ছেন, কোথায় দিচ্ছেন এবং এই শাস্তির পরিণতি কী হতে পারে — এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি কতটা সচেতন?
- ❑ পরিশেষে এই কথাও মনে রাখা দরকার, যখন আপনি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে শাস্তি দিচ্ছেন সেই সময়ে নিজের মানসিক পরিস্থিতির উপর আপনার কতটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? অর্থাৎ ছাত্র বা ছাত্রীটির আচরণে হতাশ হয়ে রেগে গিয়ে শাস্তি দিচ্ছেন? না ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনামাফিক তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি দিচ্ছেন?

অভিজ্ঞতা আমাদের বলে দেয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়ার সময় শাস্তিদাতাদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতা থাকে না। হতাশাজনিত রাগ থেকেই তাঁরা বেশিরভাগ সময় শাস্তি দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সামাল দিতে না পারায় শাস্তিদাতার মনে নিজের উপরেই অনাস্থা তৈরি হয়। সেই অনাস্থা থেকেই হতাশা এবং রাগের জন্ম — আর তার প্রকাশ শারীরিক শাস্তিদানের নানান অমানবিক ঘটনার মধ্যে আমরা দেখে থাকি।

শারীরিক শাস্তিদানের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষক বা শিক্ষিকার চেতনে বা অবচেতনে কাজ করে — সেগুলি সম্পর্কে সচেতনতা অনেক সময়ই তাঁদের মধ্যে থাকে না। এখানে এরকমই কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল —

১. ছাত্রছাত্রীর আচরণে অসন্তোষ, তার থেকে হতাশা, সেই হতাশা থেকে রাগ — সেই রাগের প্রকাশ শারীরিক শাস্তিদান।

২. ছাত্রছাত্রীর সমস্যাজনক আচরণের ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেই পরিস্থিতিকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতা থেকে হতাশা ও রাগ।

৩. অন্য কোনো কারণে আগে থেকেই মেজাজ খারাপ থাকা এবং তার জেরে ছাত্রছাত্রীদের ওপর রাগ মেটানো।

৪. ছাত্র বা ছাত্রীর আচরণের সমস্যাটিকে সমানুভূতির (empathy) সঙ্গে বুঝতে না চাওয়া।

৫. শারীরিক শাস্তি ছাড়া আরও অনেক উপায় আছে যা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর আচরণের সংশোধনে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে — সেই উপায়গুলি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহারে অক্ষমতা।

৬. ধৈর্যের অভাব, চটজলদি সমাধানের পথ খোঁজার প্রবণতা, নিজের মানসিক পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা।

৭. শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসাবে নিজের কর্তৃত্বকে শারীরিক শাস্তির মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া।

৮. শারীরিক শাস্তিকেই আচরণের সমস্যার একমাত্র দাওয়াই বলে মনে করা।

শারীরিক শাস্তিদান ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষিকারা অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের মানসিক শাস্তিও দিয়ে থাকেন — যা কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মনে প্রায় দুশ্চিন্তা ও গভীর অবসাদের জন্ম দিয়ে থাকে। এ ধরনের শাস্তি শিক্ষক শিক্ষিকারা কখনো-কখনো সরাসরি কোনো মন্তব্য বা বকাঝকার মাধ্যমে আবার কখনও হাবভাব তথা আচরণের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন যা শারীরিক শাস্তির চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়।

❖ **ছাত্রছাত্রীদের আচরণের সংশোধনে অন্য কোনো উপায়?**

হ্যাঁ অবশ্যই আছে বিকল্প উপায়। তবে তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, ছাত্রছাত্রীর মনের অনুভূতিকে বুঝতে পারার ক্ষমতা, নিজের মানসিক পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ, সমস্যার গভীরে গিয়ে বিচার বিশ্লেষণের দক্ষতা, 'জীবনশৈলী' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করা, মনিটর-ইন-কাউন্সিল গঠন করা যা বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থার অঙ্গ হবে, ছাত্র ও শিক্ষকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা, আরোপিত শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিদ্যালয়কে জাতিগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা জনিত শৃঙ্খলার অনুশীলনী, সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণ সংশোধনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। তাহলেই একজন শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকার পক্ষে সম্ভব হবে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাগ্রস্ত আচরণ সংশোধনে সাফল্য পাওয়া।

কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর আচরণ সংশোধনে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন —

❑ উদ্দেশ্য — ছাত্র বা ছাত্রীটিকে তার আচরণ যে ত্রুটিপূর্ণ তা বুঝতে এবং সমস্যাগ্রস্ত আচরণকে সংশোধন করতে তাকে সাহায্য করা। তার জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে সবচেয়ে উপযোগী এবং কার্যকর উপায় অবলম্বন করা।

- যে মুহূর্তে চিহ্নিত করলেন কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে সমস্যাগ্রস্ত আচরণের জন্য — সে মুহূর্তে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত না হয়ে পরে তাকে দেখা করতে বলুন। শাস্তি সেই মুহূর্তেই দিতে গেলে আপনার নিজের মানসিক পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা থেকে যায়।
- সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে একান্তে, একটু নিরিবিলি পরিবেশে নিয়ে গিয়ে তার যে আচরণটিকে সমস্যাজনক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন — সেই আচরণটির ফলে কী কী ঘটেছে বা কী কী ঘটার আশঙ্কা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন, সেগুলি জানান। সেই আচরণকে কেন্দ্র করে আপনার মনে যে অনুভূতি হচ্ছে, তা তাকে অকপটে বলুন। তার আগে জেনে নিন সত্যিই সে ওই আচরণটি করেছে কি না?
- যদি সে অপরাধ স্বীকার করে, তাহলে জানতে চান, কেন সে এটা করেছে? কোনো ভয়ের কারণে করেছে? না সত্যিই এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে সেটা না করে উপায় ছিল না তার? না, ইচ্ছাকৃতভাবেই সব জেনেশুনে এরকম আচরণ করেছে সে?
- এটা না করে অন্য কোনো উপায় কি ছিল সমস্যা সমাধানের?
- তার কোনো ছোটো ভাই বা বোন যদি এই আচরণ করত তাহলে তাদের প্রতি তার মনোভাব কী হত? পরবর্তীকালেও কি এইভাবেই সমস্যার সমাধানের কথা ভাববে সে?
- অপরাধ যদি স্বীকার না করে সে — সেক্ষেত্রে তাকে প্রস্তাব দিন — চল, তাহলে যারা তোমাকে দায়ি করেছে, তাদের মতামত নেওয়া যাক।

এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থে অনেক সময় দোষী ছাত্রছাত্রীরা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে। সেই মিথ্যের জন্য তাকে শাস্তি না দিয়ে, সে যে আর একটা ভুল করছে এবং এইভাবে সে অসংখ্য ভুলের ফাঁসে জড়িয়ে পড়তে পারে, সে বিষয়ে তাকে সচেতন করে তুলুন।

মূল উদ্দেশ্য যদি হয় তার সমস্যামূলক আচরণের সংশোধন, তবে প্রথমেই প্রয়োজন সেই আচরণটির ফলাফল সম্পর্কে সেই ছাত্র বা ছাত্রীর মনের মধ্যে insight (প্রকৃত সচেতনতা) তৈরি করা। সে যখন নিজে উপলব্ধি করবে, আচরণটি ঠিক হয়নি — শুধুমাত্র তখনই সে আচরণটিকে সংশোধনের কথা ভাববে। সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সেই ছাত্র বা ছাত্রী যদি অন্তর থেকে উপলব্ধি না করে, তাহলে সংশোধন — প্রক্রিয়া কতখানি কার্যকর হবে — সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। এই উপলব্ধি করানোই শিক্ষকশিক্ষিকার মূল দায়িত্ব হতে পারে। ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী না হওয়াই স্বাভাবিক।

শিশুরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

সমালোচনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল নিন্দা করতে শেখে।

শত্রুতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল হানাহানি করতে শেখে।

বিদ্রূপের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল লাজুক হতে শেখে।

কলঙ্কের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে কেবল অপরাধবোধ শেখে।

ধৈর্যের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে সহিষ্ণুতা শেখে।

উদ্দীপনার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে আত্মবিশ্বাসী হতে শেখে।

প্রশংসার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে মূল্যায়ন করতে শেখে।

নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে ন্যায়পরায়ণতা শেখে।

নিরাপত্তার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে বিশ্বাসী হতে শেখে।

অনুমোদনের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে

সে নিজেকে ভালোবাসতে শেখে।

স্বীকৃতি আর বন্ধুত্বের মাঝে বেঁচে থাকলে

সে শিশু পৃথিবীতে ভালোবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

সৌজন্যে ঃ বাংলাদেশ শিশু আকাদেমি

Government of West Bengal
Directorate of School Education
Bikash Bhavan (7th floor)
Salt Lake, Kolkata - 700 091

Memo No. 2611-GA Dated Kolkata, the 22nd January, 2009

From : The Director of School Education, West Bengal.

To 1) The Chairman,
District Primary School Council,

2) The District Inspector of Schools (SE).

3) The District Inspector of Schools (PE)

This is for information of all concerned that the National Policy on Education and the International Convention on the Rights of the Child have explicitly mentioned that any form of corporal punishment should be firmly excluded from the educational system. Corporal punishment may cause serious physical and mental injury which may have deleterious effect on the personality of the growing children. It is hence directed that —

1. All students are to be informed through campaigns and publicity drives that they have a right to speak against corporal punishment and bring it to the notice of the authorities.
2. Every School must have a forum where children can express their views.
3. Schools may identify teachers who would act as counsellors. The students could confide in them for sympathetic handling of the matter.

   Schools could have drop boxes where the students could place their problems in writing. The teacher – counsellors could address these on condition of anonymity of the students.
4. There has to be a monthly meeting of the PTAs or any other body such as the SEC/VEC to review the complaints and take action.
5. The PTAs are to be encouraged to act immediately on any complaints made by children without postponement of the issue.
6. The School Education Directorate will establish procedures for reviewing the responses to the complaints of students and monitoring actions taken on the issue.

Now, in view of the above, all recognized school authorities in the State are requested to ensure protection of children from any physical and mental assault which could cause serious injury and lead to retardation in growth of the children physically, mentally and educationally.

It has to be remembered by all concerned that a student has come to the school on the basis of the child's right to education and while dealing with these students, it is the indispensable duty of the teachers and School functionaries to see that their right to education is ensured.

Sd/- illigible
Director of School Education
West Bengal

Printed by : *Bangabasi Limited, 26, Pataldanga Street, Kolkata - 700 009. Ph : 2350 0538/9830056380*

Cover Designed by : Nabendu Sengupta